নভেম্বর ২০১৮ ▪ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৫

সচিত্র বাংলাদেশ

জেল হত্যা: ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়

হাসিনা: অ্যা ডটার'স টেল

হিজড়া: তাদের সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি

তথ্য ভবন
আধুনিক স্থাপনার অনন্য দৃষ্টান্ত

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

- যে-কোনো বিষয়ে লেখা পাঠানো যায়।
- লেখা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। লেখার সাথে চিত্র দেওয়া হলে তা ক্যাপশনসহ প্রেরণ করা আবশ্যক।
- প্রতিটি লেখার জন্য লেখক সম্মানী দেওয়া হয়।
- হার্ডকপির সাথে সিডি বা ই-মেইলে লেখা পাঠানো হলে তা অধিকতর গ্রহণযোগ্য।
- e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
  dfpsb@yahoo.com

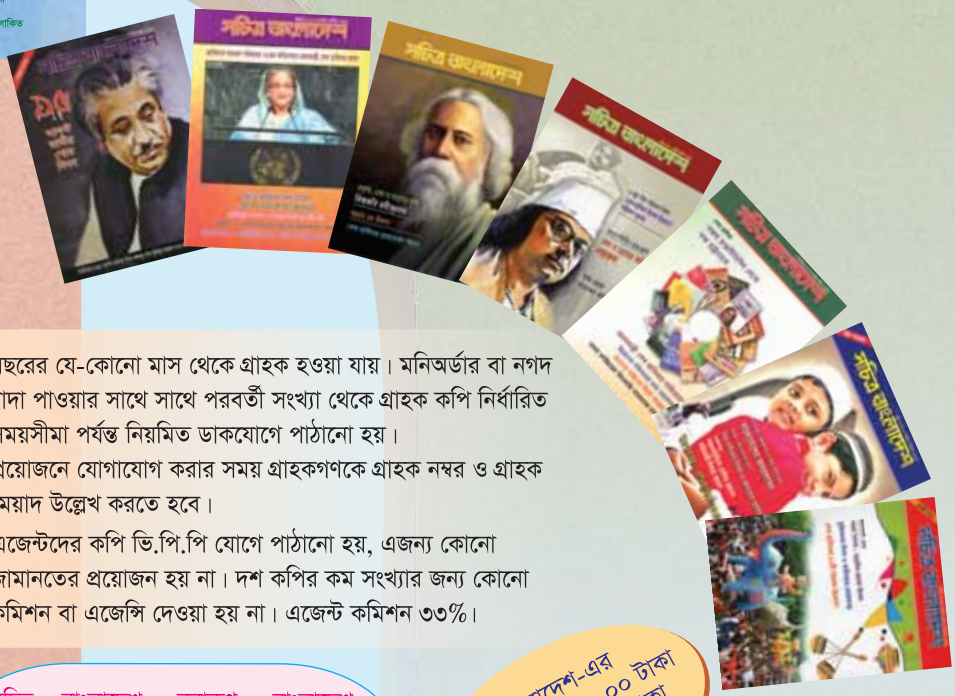

- বছরের যে-কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। মনিঅর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে গ্রাহক কপি নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত নিয়মিত ডাকযোগে পাঠানো হয়।
- প্রয়োজনে যোগাযোগ করার সময় গ্রাহকগণকে গ্রাহক নম্বর ও গ্রাহক মেয়াদ উল্লেখ করতে হবে।
- এজেন্টদের কপি ভি.পি.পি যোগে পাঠানো হয়, এজন্য কোনো জামানতের প্রয়োজন হয় না। দশ কপির কম সংখ্যার জন্য কোনো কমিশন বা এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্ট কমিশন ৩৩%।

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই **০১৫৩১৩৮৫১৭৫** বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

নবারুণ-এর
বার্ষিক চাঁদা ২৪০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১২০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা

মোবাইল অ্যাপ্স-এ
নবারুণ পড়তে
স্মার্ট ফোন থেকে
google play store-এ
nobarun লিখে
মোবাইল অ্যাপ্স
ডাউনলোড করুন।

নবারুণ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন।
লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editornobarun@dfp.gov.bd

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : **bangladeshquarterly@yahoo.com**
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ, বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ সহজে পেতে এই **০১৫৩১৩৮৫১৭৫** বিকাশ নম্বরে যোগাযোগ করে টাকা পাঠিয়ে দিন।

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

সচিত্র বাংলাদেশ

Regd.No.Dha-476 Sachitra Bangladesh Vol. 39, No. 05, November 2018, Tk. 25.00

মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত, সিলেট

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা।

সচিত্র বাংলাদেশ

নভেম্বর ২০১৮ ❑ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪২৫

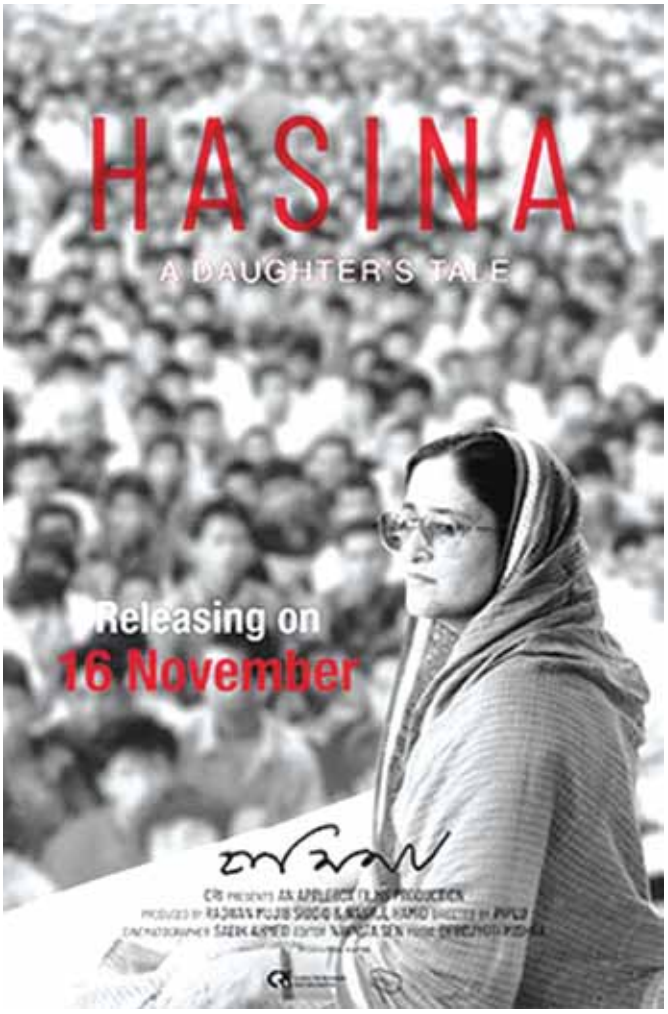

সম্পাদকীয়

৩রা নভেম্বর জাতীয় জেল হত্যা দিবস। শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বমানবতা ও গণতন্ত্রের ইতিহাসে দিনটি একটি কলঙ্কিত দিন। স্বাধীনতার স্বপক্ষের শক্তিকে ধ্বংস করার মানসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার কিছুদিনের মধ্যেই স্বাধীনতাবিরোধী চক্র ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামান মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করেন। তাঁরা ছিলেন বঙ্গবন্ধুর একান্ত কাছের বিশ্বস্ত সহযোদ্ধা ও সুহৃদ। *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর পক্ষ থেকে মহান এ বীরদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ এবং তাঁদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ১লা নভেম্বর তথ্য ভবন উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিজস্ব কম্পাউন্ডে ১৬তলা এ ভবনটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৯৬ কোটি টাকা। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের অফিস এ ভবনে স্থানান্তরিত হবে। *সচিত্র বাংলাদেশ*-এর এ সংখ্যায় তথ্য ভবন সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ৭১তম জন্মদিনে তাঁকে নিবেদিত ৭১টি কবিতার কাব্যগ্রন্থ *পিস অ্যান্ড হারমোনি* প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনীর ওপর নির্মিত ডকুড্রামা *হাসিনা: অ্যা ডটার'স টেল* দেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। কাব্যগ্রন্থ এবং ডকুড্রামাটির ওপর এ সংখ্যায় রয়েছে পর্যালোচনামূলক নিবন্ধ।

শরতের শেষে ফসলের সমারোহ নিয়ে এসেছে হেমন্ত ঋতু। নবান্নের উৎসবে মেতে উঠেছে কৃষক। আনন্দে মুখরিত কৃষক হৃদয়ের উচ্ছ্বাস স্পর্শ করেছে কবি-সাহিত্যিকদের হৃদয়, রচিত হয়েছে কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা। হেমন্তকে ঘিরে থাকছে বিশেষ নিবন্ধ।

হিজড়াদের জানা-অজানা তথ্য, জাতীয় সমবায় দিবস, যুব দিবস, আন্তর্জাতিক ডায়াবেটিস দিবস, বিশ্ব অ্যান্টিবায়োটিক সচেতনতা সপ্তাহ'র ওপর থাকছে পৃথক পৃথক নিবন্ধ। এছাড়া অন্যান্য নিয়মিত বিভাগ তো থাকছেই। আশা করি, সংখ্যাটি সকলের ভালো লাগবে।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মো: এনামুল কবীর

সম্পাদক
সুফিয়া বেগম
নাফেয়ালা নাসরিন

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
সুলতানা বেগম

সহ-সম্পাদক
সাবিনা ইয়াসমিন
জান্নাতে রোজী
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মুহাম্মদ ফরিদ হোসেন

আলোকচিত্রী
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

সম্পাদনা সহযোগী
শারমিন সুলতানা শান্তা
জান্নাত হোসেন

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৪৯৩৫৭৯৩৬ (সম্পাদক), ৯৩৩২১২৯
E-mail : editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৪২

মূল্য : পঁচিশ টাকা

গ্রাহক মূল্য : ষান্মাষিক ১৫০ টাকা এবং বার্ষিক ৩০০ টাকা।
নিয়মিত গ্রাহক হওয়ার জন্য যোগাযোগ : সহকারী পরিচালক
(বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর;
স্থানীয় এজেন্ট এবং সকল জেলা তথ্য অফিস।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়
সূচিপত্র
নিবন্ধ/প্রবন্ধ

জেল হত্যা: ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায় ৪
শামস সাইদ

জাতীয় চার নেতার জীবনী ৬
মো. কামরুল ইসলাম

তথ্য ভবন: আধুনিক স্থাপনার অনন্য দৃষ্টান্ত ৯
মো. মনিরুজ্জামান

হিজড়া: তাদের সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি ১৩
ড. মোহাম্মদ হাননান

বিশ্ব অ্যান্টিবায়োটিক সচেতনতা সপ্তাহ ২০১৮ ১৭
মোহাম্মদ হাসান জাফরী

গদ্যের জাদুকর হুমায়ূন ১৮
বিনয় দত্ত

নতুন ভাবনা: ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০
খান চমন-ই-এলাহি

হেমন্তের নবান্ন: মাঠে মাঠে কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা ২৫
নূরুল হক

আমাদের পিঠাপুলি আমাদের ঐতিহ্য ২৭
মোনাজিনা জান্নাত

কাঞ্চনজঙ্ঘার বুকে পাখি ২৮
ড. আ ন ম আমিনুর রহমান

চুনতি চাম্বি খাল রাবার ড্যাম
বদলে দিচ্ছে এলাকার কৃষি ও পর্যটন ৩০
মোহাম্মদ ইলিয়াছ

যুবদের উন্নয়নে সরকারের সাফল্য ৩১
সুলতানা বেগম

আয়কর মেলায় বিপুল সাড়া ৩৩
ইসরাত জাহান

এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ ৩৪
রোজি আক্তার

সমবায় হোক টেকসই উন্নয়নের রূপকার ৩৫
ড. এজাজ মামুন

হাসিনা: অ্যা ডটার'স টেল ৩৭
নাফেয়ালা নাসরিন

হাইলাইটস

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস: প্রয়োজন গণসচেতনতা ৩৮
কে সি বি তপু

পিস অ্যান্ড হারমোনি

শেখ হাসিনাকে নিবেদিত ৭১টি কবিতার কাব্যগ্রন্থ ৪৩
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

গল্প

প্রোটোফিলিস ৪১
জসীম আল ফাহিম

কবিতাগুচ্ছ ২৪, ৩২, ৪০
অসীম সাহা, মাকিদ হায়দার, মনজুরুর রহমান
রোকসানা গুলশান, দেলওয়ার বিন রশিদ
আবেদীন জনী, খোরশেদ আলম নয়ন
লিয়াকত আলী চৌধুরী, আ. আউয়াল রণী
আব্দুল্লাহ শিবলী সাদিক, রকিবুল ইসলাম
শাফিয়া আকতার, শাহ্ সোহাগ ফকির, এস এম তিতুমীর

বিশেষ প্রতিবেদন

রাষ্ট্রপতি ৪৪
প্রধানমন্ত্রী ৪৫
তথ্য মন্ত্রণালয় ৪৭
জাতীয় ঘটনা ৪৯
আন্তর্জাতিক ৪৯
উন্নয়ন ৫০
ডিজিটাল বাংলাদেশ ৫১
শিক্ষা ৫২
শিল্প-বাণিজ্য ৫৩
নারী ৫৪
কৃষি ৫৫
সামাজিক নিরাপত্তা ৫৬
পরিবেশ ও জলবায়ু ৫৬
নিরাপদ সড়ক ৫৭
যোগাযোগ ৫৭
মাদক প্রতিরোধ ৫৮
স্বাস্থ্যকথা ৫৯
প্রতিবন্ধী ৬০
শিশু ও কিশোর উন্নয়ন ৬১
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ৬১
সংস্কৃতি ৬২
চলচ্চিত্র ৬২
ক্রীড়া ৬৩
বিশ্বজুড়ে নভেম্বর: স্মরণীয় ও বরণীয় ৬৪

জেল হত্যা দিবস
ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়

৩রা নভেম্বর জেল হত্যা দিবস। ১৫ই আগস্টের পরে বাংলাদেশের ইতিহাসে আরো একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় জেল হত্যা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে যাঁরা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন সেই বীরসন্তানদের হত্যার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিকে নেতৃত্বশূন্য করার একটি ঘৃণ্য অপচেষ্টা ছিল জেল হত্যা। ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর ভোররাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, মন্ত্রী ক্যাপটেন এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামানকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। এ বিষয়ে নিবন্ধ পড়ুন, পৃষ্ঠা-৪

তথ্য ভবন
আধুনিক স্থাপনার অনন্য দৃষ্টান্ত

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা নভেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে উদ্‌বোধন করেন অত্যাধুনিক তথ্য ভবন। বেজমেন্ট পার্কিংসহ ১৬তলা তথ্য ভবন নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৯৬ কোটি টাকা। এখানে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের অফিস স্থানান্তরিত হবে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিজস্ব কম্পাউন্ডে প্রায় ২ বিঘা জমির ওপর ২ লক্ষ বর্গফুট আয়তনের এই তথ্য ভবনে কনফারেন্স রুম, সভাকক্ষ, প্রজেকশন হল, পোস্ট প্রডাকশন ও সুটিং স্টুডিও, একাধিক মাল্টিপারপাস হল, মিউজিয়াম, ডিসপ্লে গ্যালারি, ডরমিটরি, রিহার্সাল ও রেকর্ডিং কক্ষ, বই ও ফিল্মের জন্য পৃথক লাইব্রেরি, সেন্সর বোর্ডের জুরি বোর্ডের মিটিং রুমসহ আধুনিক প্রযুক্তিগত সকল সুবিধা থাকবে। এছাড়া এ ভবনের পাশে একটি ৩ তলা এনেক্স ভবন এবং পেছনে ওয়াকওয়ে পরিবেষ্টিত একটি দৃষ্টিনন্দন পুকুর পুনঃখনন করা হয়েছে। এ নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ পড়ুন, পৃষ্ঠা-৯

হিজড়া: তাদের সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি

বিভিন্ন নামে তাদের ডাকা হয়। হিজড়া, শিখণ্ডি, খোঁজা, বৃহন্নলা, তৃতীয় লিঙ্গ, উভয় লিঙ্গ, নপুংসক। ইংরেজি ভাষায় ট্রান্স জেন্ডার, হার্মফ্রোডাইট, হিব্রু ভাষায় ইউনাক এবং আরবি ভাষায় খুনসা ইত্যাদি। যে নামেই তাদের ডাকা হোক না কেন তারা আমাদের সমাজেরই একটি অংশ। প্রকৃতপক্ষে তারা নারী-পুরুষের বাইরে আরেকটি লিঙ্গ বৈচিত্র্যের মানবধারা। তাদের সম্পর্কে আমাদের ধারণা একেবারেই সীমিত। তাদের আচরণ, প্রকৃতি, রীতিনীতি ও জীবনধারণের পদ্ধতি সম্পর্কে জানা-অজানা নানা তথ্য জানতে পড়ুন ড. মোহাম্মদ হাননানের প্রবন্ধ। পৃষ্ঠা-১৩

এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে বেশ সফলতার পরিচয় দিয়েছে। নির্ধারিত সময়সীমার আগেই অনেক ক্ষেত্রে সাফল্য এসেছে এদেশে। চরম দারিদ্র্যের হার হ্রাস পেয়েছে, বেড়েছে মাথাপিছু আয়, মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে। শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন খাতে যুগান্তকারী অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে স্বপ্নের সোনার বাংলা। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অর্জনের ওপর ফিচার দেখুন, পৃষ্ঠা-৩৪

ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ দেখুন
www.dfp.gov.bd
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd, dfpsb@yahoo.com
www.facebook.com/sachitrabangladesh/

মুদ্রণে : রূপা প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ২৮/এ-৫ টয়েনবি সার্কুলার রোড মতিঝিল, ঢাকা-১০০০। ফোন: ৭১৯৪৭২০

জেল হত্যা: ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়

শামস সাইদ

১৫ই আগস্টের পরে ইতিহাসের আরো একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় জেল হত্যা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতে যাঁরা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন সেই সূর্যসন্তানদের হত্যার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতিকে নেতৃত্বশূন্য করার একটি সফল প্রচেষ্টা। যাঁদের হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনে বাংলাদেশ নাম ধ্বনিত হতো সেই জাতীয় চার নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামান। সপরিবার বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর এই চার নেতাকে হত্যা করা হয়।

১০ই জানুয়ারি ১৯৭২, পাকিস্তানের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশে ফেরার পর জাতির পিতার সঙ্গে জাতীয় চার নেতা, আনন্দে সবাই অশ্রুসজল

১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যার মধ্য দিয়ে ক্ষমতা দখল করেও ঘাতকরা নিজেদের নিরাপদ ভাবতে পারেনি। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, এই চার নেতা জীবিত থাকলে তারা কোনোদিন পার পাবে না। এঁরা বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার ও তাঁর আদর্শ বাস্তবায়নে অটুট থাকবেন। তাই রাতের অন্ধকারে হত্যা করা হয় চার নেতাকে।

১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর খন্দকার মোশতাক তার মন্ত্রিসভায় যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান করেন এই চার নেতাকে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তাঁর নেতৃত্বে অবিচল থেকে একটা দেশকে স্বাধীন করে আনা এই চার নেতা গাদ্দার মোশতাকের আহ্বানে সাড়া দেয়নি। সে জন্যই তাঁদেরকে হত্যা করা হয়। ব্রাশ ফায়ারের পর বেয়নেট নিয়ে নারকীয় উল্লাসে মেতে ওঠে বর্বর হায়েনাগুলো।

১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর। সোমবার ভোররাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের সুরক্ষিত নিরাপদ কক্ষে স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ, মন্ত্রী এম মনসুর আলী ও এএইচএম কামারুজ্জামানকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। এ হত্যাকাণ্ডের ৭৯ দিন আগে '৭৫-এর ১৫ই আগস্ট শুক্রবার ভোরে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবার হত্যা করা হয়।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার এক ঘণ্টার মধ্যেই স্বাধীনতাবিরোধী হিসেবে চিহ্নিত মুজিব মন্ত্রিসভার বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদের নাম রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। মোশতাক, ১৫ই আগস্ট হত্যা ষড়যন্ত্রের অন্যতম হোতা ও ঘাতক। তবে এই মোশতাক জাতির পিতার সহকর্মী এবং আওয়ামী লীগের একজন শীর্ষ নেতা ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও ছিল এ চক্রান্তকারী মোশতাক। তবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী থেকেই বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির সঙ্গে মিলে স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত ছিল। যুদ্ধ চলাকালে মোশতাকের ষড়যন্ত্রের কথা জানাজানি হয়ে যায়। ফলে একাত্তরের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসেই প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে খন্দকার মোশতাককে কার্যত অপসারণ করেন। যুদ্ধের শেষ কয়েক মাস মোশতাক অনেকটা গৃহবন্দি ছিল। যে কারণে '৭১-এ জাতিসংঘ অধিবেশনে প্রেরিত বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন তৎকালীন সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর '৭২-এর ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব দেশে এসে ১২ই জানুয়ারি যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। খন্দকার মোশতাককে ওই মন্ত্রিসভায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও পানিসম্পদমন্ত্রী করা হয়।

চতুর, ধুরন্ধর ও চানক্য খন্দকার মোশতাক এবং তার সহযোগিরা স্বাধীনতাবিরোধী একটি পরাশক্তি ও পাকিস্তানের ভুট্টোচক্রের মদদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব এবং জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করেছে। '৭১-এ পাকিস্তানের সেনাবাহিনী জাতির পিতাকে হত্যা করতে পারেনি। স্বাধীন বাংলাদেশে '৭৫ সালে বাঙালি সেনাবাহিনী সে কাজটি করেছিল। এরা ছিল স্বাধীনতাবিরোধী চক্র। সেই চক্রান্তকারী গোষ্ঠীই জেলখানায় জাতীয় চার নেতাকে হত্যা করেছে। স্বাধীনতাবিরোধীদের প্রতিনিধি মোশতাক ও ঘাতক ফারুক-রশীদচক্র ১৬ই আগস্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নাম পরিবর্তন করে ইসলামি প্রজাতন্ত্র রাখার চেষ্টা করেছিল।

বাংলাদেশকে পরাজিত পাকিস্তানের আদলে একটি 'মিনি পাকিস্তান' বানানোর লক্ষ্যেই রাষ্ট্রের স্থপতি মহান নেতা শেখ মুজিব এবং তাঁর বিশ্বস্ত সিপাহসালার জাতীয় চার নেতাকে সুপরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়। ১৫ই আগস্ট থেকেই আত্মস্বীকৃত ঘাতক ফারুক-রশীদ ট্যাংক নিয়ে বঙ্গভবনে অবৈধ রাষ্ট্রপতি মোশতাকের সঙ্গে অবস্থান করে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার দিন থেকেই বাংলাদেশ বেতারকে পাকিস্তান স্টাইলে রেডিও বাংলাদেশ নামকরণ করা হয়। ঘৃণ্য মোশতাক প্রথম ভাষণেই তার মদদদাতা পাকিস্তানি প্রভুদের নির্দেশে 'জয় বাংলা'র পরিবর্তে সেই পুরনো পরিত্যক্ত জিন্দাবাদ ধ্বনি চালু করে।

অথচ ১৯৭১ সালে ৩০ লাখ শহিদের তাজা রক্ত এবং ২ লাখ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানের কবরের ওপর অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। যুদ্ধকালীন সম্মুখসমরে মুক্তিযোদ্ধারা 'জয় বাংলা' রণধ্বনি দিয়েই শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। মূলত আমাদের মহান মুক্তি সংগ্রামের রণধ্বনিই ছিল 'জয় বাংলা'। একাত্তরেই 'জয় বাংলা'র কাছে জিন্দাবাদের কবর রচিত হয়। কারা একাত্তরের রণধ্বনি জয় বাংলার পরিবর্তে পরিত্যক্ত জিন্দাবাদ নিয়ে এখনো মাতামাতি করে, দেশপ্রেমিক মানুষদের তা না বোঝার কথা নয়।

ক্ষমতা দখলকারী খুনি মোশতাক-ফারুক-রশীদচক্র ১৫ই আগস্ট থেকেই নিবেদিতপ্রাণ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায়। এক শ্রেণির ভিতু-কাপুরুষ, সুবিধাবাদী বুঝে না বুঝে খুনি মোশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগদান করে। সাহসী ও দেশপ্রেমিকরা জাতির পিতার এ হত্যাকাণ্ড মেনে নিতে পারেননি। সৈয়দ নজরুল ইসলাম মোশতাক সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি হওয়ার প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এম. মনসুর আলী ১৫ই আগস্ট সকালেই ঘাতকচক্রকে নির্মূল করতে বিমানবাহিনী প্রধান এ কে খন্দকারসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এ মহান নেতা মোশতাকের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার প্রস্তাব মুখের ওপর ঘৃণার সঙ্গেই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ১৫ই আগস্ট সকালেই মনসুর আলী সরকারি বাসভবন ছেড়ে আত্মগোপনে চলে যান। একজন ব্যক্তিগত স্টাফের বিশ্বাসঘাতকতা এবং ওবায়দুর রহমানের তৎপরতায় গোপন স্থান থেকে মনসুর আলীকে বঙ্গভবনে মোশতাকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘাতক মোশতাক প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করার আহ্বান জানান তাঁকে। দুজনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল ভালো। হতচকিত মনসুর আলী অবৈধ মোশতাককে বলেন, তুমি শেখ মুজিবকে হত্যা করলে, করতে পারলে? আবেগে-কান্নায়-ঘৃণায় বুজে এলো তাঁর কণ্ঠ। গৃহবন্দি চার নেতাসহ আওয়ামী লীগের ১৯ জনকে ২২শে আগস্ট ঢাকা জেলে নেওয়া হলো। ২রা নভেম্বর মধ্যরাতে খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে একটি অভ্যুত্থান হয়। মাসকারেনহাস তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, ক্ষমতা দখলের পরই মোশতাক, ফারুক ও রশীদ একটি পরিকল্পনা তৈরি করে রাখে। সেটা হচ্ছে অন্য কেউ ক্ষমতা দখল করলে সর্বপ্রথম একটি কিলার গ্রুপ জেলে গিয়ে চার নেতাকে হত্যা করবে। সুবেদার মুসলেমের নেতৃত্বে কিলারদের নামও নির্দিষ্ট করে রাখা হয়। খালেদের অভ্যুত্থান শুরু হলে বর্বর মুসলেমের নেতৃত্বে চার সেনা সদস্য ঢাকা জেলে গিয়ে চার নেতাকে হত্যা করে। মোশতাকের পর বিচারপতি সায়েমকে রাষ্ট্রপতি করা হয়। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে সেনাপ্রধান, সশস্ত্রবাহিনী প্রধান, উপ-প্রধান ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং রাষ্ট্রপতি হিসেবে সর্বময় ক্ষমতার মালিক বনে যান জেনারেল জিয়া। জেনারেল জিয়া শুধু বঙ্গবন্ধু ও জেল হত্যার বিচার বন্ধ রাখেননি, আত্মস্বীকৃত খুনিদের বিদেশি মিশনে উচ্চ পদে চাকরি দিয়ে পুরস্কৃত করেন।

২০০৪ সালের ২০শে অক্টোবর বুধবার জেল হত্যা মামলার রায়ে ৩ জনকে মৃত্যুদণ্ড ও ১২ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ফাঁসিতে দণ্ডিত ৩ জনই পলাতক রয়েছে আর যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত ১২ জনের মধ্যে ৯ জন পলাতক, বাকি ৩ জন জেলে আটক রয়েছে। রায়ে ৪ জন রাজনীতিক ও ১ জন সরকারি কর্মকর্তাকে বেকসুর খালাস দেওয়া হয়। জাতীয় চার নেতার পরিবার এই রায় প্রত্যাখ্যান করে বলেছে, বিচার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়নি। বিভিন্ন পত্রিকায় এ রায়ের তীব্র সমালোচনা করা হয়।

গত চার দশকে ১৫ই আগস্ট ও ৩রা নভেম্বরের হত্যাকাণ্ড বিষয়ে অনেক তথ্য-প্রমাণ ও দলিল বের হয়েছে। এ নিয়ে অনেকে বই লিখেছেন। পত্রপত্রিকায় এ সম্পর্কে শত শত লেখা বের হয়েছে। এ দুই হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সম্পর্কে সেসময় সামরিকবাহিনীতে কর্মরত কর্নেল শাফায়াত জামিল, জেনারেল মইনুল হোসেন চৌধুরী, সদ্য প্রয়াত কর্নেল এমএ হামিদ ও ব্রিগেডিয়ার সাখাওয়াত হোসেনসহ আরো অনেকে বই লিখেছেন। তাছাড়া ৩রা নভেম্বর জাতীয় চার নেতা হত্যার সময় আইজি প্রিজন নূরুজ্জামান, ডিআইজি প্রিজন কে. আবদুল আউয়াল, জেলার আমিনুর রহমান, সুবেদার আবদুল ওয়াহেদ মৃধা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। তারা চারজনই ছিলেন চার নেতা হত্যার প্রত্যক্ষদর্শী। তাজউদ্দীন কন্যা সিমিন হোসেন রিমির গ্রন্থে এ সাক্ষাৎকারগুলো রয়েছে। এ চারজনের সাক্ষাৎকার এবং সামরিকবাহিনীর কর্মকর্তাদের লেখা গ্রন্থ থেকে জানা যায়, অবৈধ রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক ও কর্নেল রশীদ ২রা নভেম্বর মধ্যরাতের পর বঙ্গভবন থেকে ফোনে আইজি প্রিজনকে মুসলেমের নেতৃত্বে ৪ খুনিকে জেলে প্রবেশ করতে দিতে নির্দেশ দেয়। অন্তত দুবার খুনি মোশতাক আইজি প্রিজনকে বলে, সশস্ত্র মুসলেমরা যা করতে চায়, তাই যেন করতে দেওয়া হয়। জেলগেটের খাতায় ওই চার খুনির নাম লেখা রয়েছে।

সশস্ত্র খুনিরা জেলে ঢুকেই বলে তারা চার নেতাকে হত্যা করতে এসেছে। এ সময় আইজি আবারো বঙ্গভবনে ফোন করলে মোশতাক ও রশীদ হত্যাকাণ্ড ঘটাতে সম্মতি দেয়। চারজনকে গুলি করে খুনিরা বের হয়ে আসার কিছুক্ষণ পর আবার জেলে যায়। দ্বিতীয়বার গিয়ে তারা বেয়নেট দিয়ে চার নেতার শরীরে আঘাত করে। ৪ঠা নভেম্বর ডিআইজি প্রিজন কে. আবদুল আউয়াল লালবাগ থানায় মামলা করেন। এজাহারে ৪ খুনির নাম লেখা ছিল। এখনো জেলগেটের খাতায় এবং লালবাগ থানায় মোশতাক ও রশীদের নির্দেশে যে চার খুনি চার নেতাকে গুলি করেছে, বেয়নেট চার্জ করেছে– তাদের নাম লেখা রয়েছে। মোশতাক মারা গেছে সত্য। মৃত ব্যক্তির কি বিচার হয় না? রায়ে উল্লেখ থাকলে পরবর্তী প্রজন্ম জানতে পারত রাষ্ট্রপতির গদিতে অধিষ্ঠিত কুলাঙ্গার মোশতাকের নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধের মহান চার নেতাকে হত্যা করা হয়েছে।

লেখক: সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

জাতীয় চার নেতার জীবনী

মো. কামরুল ইসলাম

সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপটেন মোহাম্মদ মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামান–এই চারটি নাম বাংলাদেশের ইতিহাসে উজ্জ্বল নক্ষত্রসম। এই চারজনকে ছাড়া স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা হয়ত সম্ভব হতো না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ১৯৭১-এ স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য অপরিসীম ভূমিকা রেখেছেন এই চারজন। বাঙালি জাতি আজও এই চার মহান নেতাকে জাতীয় চার নেতা হিসেবে চেনে। ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর কারাগারের অভ্যন্তরে ঘাতকের ব্রাশ ফায়ারে নিহত হওয়া চার মহান নেতা হত্যা মামলার রায় দেওয়া হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশের এই চার সূর্যসন্তানদের জীবনী নিচে তুলে ধরা হলো–

সৈয়দ নজরুল ইসলাম (১৯২৫-৭৫): মুজিবনগরের অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। ১৯২৫ সালে কিশোরগঞ্জ জেলার যশোদল দামপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৭ সালে এমএ (ইতিহাস) এবং ১৯৫৩ সালে এলএলবি ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে তিনি সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ইউনিয়নের সহ-সভাপতি ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি মুসলিম ছাত্রলীগের সম্পাদক নির্বাচিত হন। ভাষা আন্দোলনকালে গঠিত সর্বদলীয় অ্যাকশন কমিটির সদস্য হিসেবে ভাষা আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান সেন্ট্রাল সুপিরিয়র সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কর বিভাগে অফিসার পদ লাভ করেন। ১৯৫১ সালে সরকারি চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। পরে তিনি ময়মনসিংহে আইন ব্যবসা শুরু করেন। ১৯৫৭ সালে তিনি ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৬৪ সালে তিনি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৭২ সাল পর্যন্ত উক্ত পদে সমাসীন ছিলেন। ১৯৬৬ সাল থেকে ৬ দফা আন্দোলনের তীব্রতা বাড়তে থাকলে আইয়ুব সরকার আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ মুজিবসহ বহুসংখ্যক নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে। সেই সংকটময় সময়ে (১৯৬৬-৬৯) সৈয়দ নজরুল ইসলাম আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৯ সালে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল 'ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি' নামে একটি সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন করে এবং এর অন্যতম প্রধান নেতা হিসেবে তিনি আইয়ুব বিরোধী গণ-আন্দোলনে (জানুয়ারি-মার্চ, ১৯৬৯) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা নিরসনের লক্ষ্যে রাওয়ালপিন্ডিতে সরকারের সাথে বিরোধী দলগুলোর গোলটেবিল বৈঠকে (২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১০-১৩ মার্চ, ১৯৬৯) তিনি আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি দলের সদস্য ছিলেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে ময়মনসিংহ-১৭ নির্বাচনি এলাকা থেকে তিনি গণপরিষদের সদস্য এবং আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের উপনেতা নির্বাচিত হন। ১৯৭১-এর অসহযোগ আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল প্রশংসনীয়। ঢাকায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ইয়াহিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে (১৯শে মার্চ, ১৯৭১) সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন বঙ্গবন্ধুর অন্যতম সঙ্গী। ২৫শে মার্চ ১৯৭১ শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতারের পর সৈয়দ নজরুল ইসলাম দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। নবগঠিত এই সরকারের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থাকায় তাঁর অনুপস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ সরকারের নতুন মন্ত্রিপরিষদে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯৭৫ সালের ২৪শে জানুয়ারি পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য হিসেবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর পুনর্গঠনে তিনি নিরলস কাজ করেছেন। ১৯৭২ সালে তিনি আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির উপনেতা নির্বাচিত হন। ১৯৭৩ সালে সাধারণ নির্বাচনে ময়মনসিংহ-২৮ নির্বাচনি এলাকা থেকে তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব লাভ করেন। তিনি দ্বিতীয়বারের মতো জাতীয় সংসদে দলের উপনেতা নির্বাচিত হন। তিনি শিল্পমন্ত্রী থাকাকালীন অনেক শিল্পকারখানা জাতীয়করণ করা হয়। ১৯৭৫ সালে সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপরাষ্ট্রপতি হন। এই বছর বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠিত হলে তিনি এর সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট সেনাবাহিনীর কতিপয় বিপথগামী সদস্য কর্তৃক সপরিবার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হন। এরপর দেশে সামরিক আইন জারি করা হয় এবং খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হয়ে পুরনো সহকর্মীদের কয়েকজনকে তার মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করে। কিন্তু সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ চার নেতা (তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী এবং এএইচএম কামারুজ্জামান) উক্ত মন্ত্রিসভায় যোগদানে অস্বীকৃতি জানালে ২৩শে আগস্ট গ্রেফতার হয়ে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি হন। ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর মধ্যরাতে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ চার নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাঁকে বনানী কবরস্থানে সমাহিত করা হয়।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম

তাজউদ্দীন আহমদ (১৯২৫-৭৫): বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া থানার দরদরিয়া গ্রামে ১৯২৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাজউদ্দীন আহমদ ১৯৪৪ সালে ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯৪৮ সালে আইএ এবং ১৯৫৩ সালে ঢাকা

তাজউদ্দীন আহমদ

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে কারাবন্দি অবস্থায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে তিনি আইনশাস্ত্রে ডিগ্রি লাভ করেন। রাজনীতিক ও আইনজীবী তাজউদ্দীন আহমদ পবিত্র কোরানে হাফেজও ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকেই তাজউদ্দীন আহমদ রাজনীতিতে সক্রিয় হন। ১৯৪৩ সাল থেকে তিনি মুসলিম লীগের সক্রিয় সদস্য ছিলেন এবং ১৯৪৪ সালে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। পাকিস্তান আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর মুসলিম লীগ সরকারের গণবিচ্ছিন্ন রাজনীতির প্রতিবাদে তিনি এ দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তিনি ছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের (১৯৪৯) অন্যতম উদ্যোক্তা। তিনি ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত পূর্ব বাংলা ছাত্রলীগের (বর্তমান বাংলাদেশ ছাত্রলীগ) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে তিনি ভাষা আন্দোলনকালে গ্রেফতার হন এবং কারা নির্যাতন ভোগ করেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত এ সংগঠনের নির্বাহী পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৭ সালে তিনি ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ছিলেন। তাজউদ্দীন আহমদ ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী হিসেবে কাপাসিয়া থেকে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ওই বছরই তিনি ৯২-ক ধারায় গ্রেফতার হন। ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তিনি আওয়ামী লীগের সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন জারির পর আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে তাজউদ্দীন আহমদ গ্রেফতার হন এবং ১৯৫৯ সালে মুক্তিলাভ করেন। ১৯৬২ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে তিনি কারাবরণ করেন। ১৯৬৪ সালে আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত হওয়ার পর তিনি দলের সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হন। ওই বছর এপ্রিলে তিনি গ্রেফতার হন। ১৯৬৬ সালে তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ৬ দফা আন্দোলনের সময় দেশরক্ষা আইনে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৯ সালের গণ-আন্দোলনে তিনি দলের পক্ষ থেকে নেতৃত্ব দেন। রাজনৈতিক বিরোধ নিরসনের লক্ষ্যে বিরোধী দল ও সরকারের মধ্যে আলোচনার জন্য রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান কর্তৃক আহূত গোলটেবিল বৈঠকে (১৯৬৯) তিনি আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদলের সদস্য ছিলেন। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে তিনি জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। পাকিস্তান সরকার সত্তরের নির্বাচনের গণরায়কে কার্যত অস্বীকার করে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দুর্বার অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় এবং তাজউদ্দীন আহমদ এ আন্দোলনের অন্যতম সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকবাহিনী গণহত্যা শুরু করলে তিনি ঢাকা ত্যাগ করে ভারত গমন করেন। ১০ই এপ্রিল প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে তিনি এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন। মুক্তিবাহিনীর জন্য অস্ত্র সংগ্রহ ও মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয়ের পর ১৯৭১ সালের ২২শে ডিসেম্বর তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সদ্য স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠিত হলে (১৯৭২) তাজউদ্দীন আহমদ প্রথমে অর্থ এবং পরে অর্থ ও পরিকল্পনামন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন। বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য হিসেবে তিনি সংবিধান প্রণয়নে বিশিষ্ট ভূমিকা রাখেন। ১৯৭৩ সালে তিনি ঢাকা-২২ আসন থেকে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট ঘাতকদের হাতে শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবার নিহত হলে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে এবং ২৩শে আগস্ট তাজউদ্দীন আহমদকে গ্রেফতার করা হয়। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি অবস্থায় ৩রা নভেম্বর অপর তিন জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এএইচএম কামারুজ্জামান এবং এম মনসুর আলীর সঙ্গে তাঁকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তাজউদ্দীন আহমদ বাংলাদেশের স্থপতি শেখ মুজিবুর রহমানের একজন ঘনিষ্ঠ সহকর্মী হিসেবে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন।

মোহাম্মদ মনসুর আলী (১৯১৯-১৯৭৫): মোহাম্মদ মনসুর আলী সিরাজগঞ্জ জেলার রতনকান্দি ইউনিয়নের কুড়িপাড়া গ্রামে ১৯১৯ সালের ১৬ই জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম ছিল হরফ আলী সরকার। পড়াশোনা শুরু করেন কাজিপুরের গান্ধাইল হাই স্কুলে। এরপর চলে আসেন সিরাজগঞ্জ বিএল হাই স্কুলে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এখান থেকেই। এরপর ভর্তি হন পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে। শিক্ষা জীবনের বিভিন্ন সময় জায়গির থেকে পড়াশোনা করেছেন মনসুর আলী। উচ্চ মাধ্যমিক পাস করার পর ১৯৪১ সালে কলকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ পাস করেন। ভর্তি হন আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৪৫ সালে এখান থেকেই অর্থনীতিতে এমএ এবং এলএলবিতে প্রথম শ্রেণি লাভ করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি

মোহাম্মদ মনসুর আলী

গাইবান্ধার পলাশবাড়ির আমির উদ্দিন সরকারের কন্যা আমেনা খাতুনকে বিয়ে করেন। ১৯৫১ সালে আইন ব্যবসা শুরু করেন পাবনা জেলা আদালতে। আইনজীবী হিসেবে তিনি ছিলেন একজন সফল ব্যক্তি। পাবনা আইনজীবী সমিতির নির্বাচিত সভাপতিও ছিলেন তিনি। আলীগড় থেকে দেশে ফেরার পর তিনি জড়িয়ে পড়েন রাজনীতির সাথে। মুসলিম লীগের রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এই নবীন আত্মসচেতন ব্যক্তি। ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত ছিলেন পাবনা জেলা মুসলিম লীগের সহ-সভাপতি। ১৯৪৮ সালে তিনি যশোর ক্যান্টনমেন্টে প্রশিক্ষণ নেন এবং পিএলজির ক্যাপটেন পদে অধিষ্ঠিত হন। এ সময় থেকেই তিনি ক্যাপটেন মনসুর নামে পরিচিত হতে থাকেন। ১৯৫১ সালে তিনি আওয়ামী মুসলিম লীগে যোগ দেন। জড়িয়ে পড়েন সক্রিয় রাজনীতিতে। আওয়ামী মুসলিম লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য হন এবং দলের পাবনা জেলা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন তিনি। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেন। এ নির্বাচনে পাবনা-১ আসনে সবাইকে অবাক করে দিয়ে বিপুল ভোটে জয়লাভ করেন মনসুর আলী। ১৯৫৬ সালে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে বিভিন্ন সময় পূর্ববঙ্গ কোয়ালিশন সরকারের আইন ও সংসদ বিষয়ক, খাদ্য ও কৃষি এবং শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব লাভ করেন তিনি। ১৯৭০ সালের ১৭ই ডিসেম্বর পাবনা-১ আসন থেকে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১-এ মুজিবনগর সরকারের অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে মনসুর আলী পুনরায় পাবনা-১ আসন থেকে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এ বছর তিনি আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি দলের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক গঠিত বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগের (বাকশাল) সেক্রেটারি জেনারেলও ছিলেন ক্যাপটেন মনসুর। ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর মধ্যরাতে অন্য জাতীয় চার নেতার সঙ্গে তাঁকে হত্যা করা হয়।

আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান (১৯২৬-১৯৭৫): নাটোর মহকুমার বাগাতীপাড়া থানার নূরপুর গ্রামে মামার বাড়িতে ১৯২৬ সালের ২৬শে জুন জন্মগ্রহণ করেন এএইচএম কামারুজ্জামান। পড়াশোনার শুরু রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী বিদ্যালয় রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে। বিশিষ্ট সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও সমাজসেবক আব্দুস সামাদ ছিলেন তাঁর পড়াশোনার প্রেরণার উৎস। রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক ছিলেন তাঁর এক ফুপা। তিনি রাজশাহী থেকে চট্টগ্রামে বদলি হয়ে যাওয়ার সময় কামারুজ্জামান হেনাকেও সঙ্গে নিয়ে যান এবং চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি করে দেন। সেখান থেকেই তিনি মাধ্যমিক পাস করেন। এরপর রাজশাহী কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৪৬ সালে অর্থনীতিতে অনার্সসহ স্নাতক পাস করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার পাঠ শেষ করে তিনি চলে এসেছিলেন নিজ শহর রাজশাহীতে। চলতে থাকে রাজনীতি। রাজশাহী কলেজ যে বছর আইন বিভাগ খোলে, সে বছর প্রথম ব্যাচেই অর্থাৎ ১৯৫৬ সালে তিনি এখান থেকেই লাভ করেন বিএল ডিগ্রি। শুরু করেন আইন পেশা। তিনি বঙ্গীয় মুসলিম ছাত্রলীগের রাজশাহী জেলা শাখার সম্পাদক হন ১৯৪২ সালে। বঙ্গীয় মুসলিম ছাত্রলীগের নির্বাচিত সহ-সভাপতি ছিলেন

আবুল হাসনাত মোহাম্মদ কামারুজ্জামান

১৯৪৩-৪৫ সাল পর্যন্ত। ১৯৫৬ সালে কামারুজ্জামান আওয়ামী লীগে যোগ দেন। ১৯৬২ ও ১৯৬৬ সালে পর পর দুবার এএইচএম কামারুজ্জামান পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬৬ সালে ঐতিহাসিক ৬ দফার সময় তিনি ৬ দফা আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেন। পরের বছর ১৯৬৭ সালে নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং বিরোধীদলীয় উপনেতা নির্বাচিত হন। আইয়ুব সরকারের নির্যাতনের প্রতিবাদে এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ১১ দফা দাবির সমর্থনে ১৯৬৯ সালে তিনি পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য পদ থেকে পদত্যাগ করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পুনরায় তিনি রাজশাহী থেকে জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভায় স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন কামারুজ্জামান। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন কামারুজ্জামান। শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালে নির্বাচন দিলে এ সাধারণ নির্বাচনে তিনি রাজশাহীর দুটি (সদর গোদাগাড়ি ও তানর) আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসের ১৮ তারিখে তিনি মন্ত্রিপরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। এ সময় তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৭৫ সালে নতুন মন্ত্রিসভায় তিনি শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর মধ্যরাত্রিতে অন্য জাতীয় চার নেতাদের সঙ্গে তাঁকেও হত্যা করা হয়।

জাতির পিতার সাথে জাতীয় চার নেতা ১৯৭১-এ প্রমাণ করে দেখিয়েছেন সৎসাহস থাকলে যে-কোনো শক্তিকে মোকাবিলা করা যায়। তাঁরা দেখিয়েছেন কীভাবে দা, কুড়াল, লগি, বৈঠা নিয়ে একটি দেশকে স্বাধীন করা যায়। বিশ্ববাসী দেখেছে, কীভাবে গভীর মনোবল নিয়ে এদেশের দামাল ছেলেরা অত্যন্ত দুর্ধর্ষ নিয়মিত একটি সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছে। এ জাতিকে বার বার প্রতিক্রিয়াশীলরা দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে কিন্তু কোনোবারই শেষ পর্যন্ত সফল হতে পারেনি। আসুন, আমরা দলমতনির্বিশেষে জাতীয় চার নেতার মুক্তিযুদ্ধে অবদানকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করি। তাঁদের বিদেহী আত্মার প্রতি অশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা জানাই। ঘৃণা করি, তাঁদের হত্যাকারী এবং সেই হত্যার পেছনে থাকা ও হত্যাকাণ্ডের সুবিধাভোগী সকল কুচক্রীদের।

লেখক: সাংবাদিক ও কলাম লেখক

তথ্য ভবন

আধুনিক স্থাপনার অনন্য দৃষ্টান্ত

মো. মনিরুজ্জামান

তথ্য ভবন। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিজস্ব কম্পাউন্ডে নির্মিত ১৬ তলা ভবনটি হালনাগাদ প্রযুক্তির সুবিধা সংবলিত একটি আধুনিক ভবন। তথ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের অফিস স্থানান্তরের লক্ষ্যে এই ১৬ তলা ভবন সম্প্রতি যাত্রা শুরু করেছে। ১লা নভেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে দেশের ৫৬টি জেলায় ২০টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আওতায় ৩২১টি প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সাথে তথ্য ভবনের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২০১৫ সালের ১২ই আগস্ট এ ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর থেকে তথ্য ভবন নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় শুরু হয় এই বিশাল কর্মযজ্ঞ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১২ই আগস্ট ২০১৫ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর প্রাঙ্গণে তথ্য ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

পটভূমি

দেশজুড়ে সরকারের নেওয়া বিভিন্ন উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের প্রচার এবং এর সাথে সর্বশ্রেণির জনগণকে সম্পৃক্ত করার পাশাপাশি দেশের ভাবমূর্তি বিদেশে সমুজ্জ্বল রাখার ক্ষেত্রে তথ্য মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের অধীন তিনটি প্রতিষ্ঠান চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর প্রিন্ট ও ভিডিও প্রচারসামগ্রী প্রস্তুত করে। গণযোগাযোগ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে অবস্থিত ৬৮টি অফিসের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে সরকারের প্রচারসামগ্রী বিতরণ ও প্রদর্শন করে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড সুস্থধারার চলচ্চিত্রের বিকাশ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে। বাস্তবতার নিরিখে সরকারের সফল প্রচার কর্মকাণ্ডের স্বার্থে এ তিনটি দপ্তরের কাজের মধ্যে বিশেষ সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। কিন্তু দপ্তরগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিত। এরমধ্যে ঐতিহ্যবাহী গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের নিজস্ব কোনো স্থায়ী ভবন নেই, ভাড়াবাড়িতে তাদের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। অপরদিকে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের অধিকাংশ কর্মকাণ্ড জরাজীর্ণ পরিত্যক্ত ভবনে ঝুঁকি নিয়ে পরিচালিত হয়ে আসছিল ।

এ তিনটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে একটি আধুনিক প্রযুক্তি সুবিধাসম্পন্ন ভবন নির্মাণের ভাবনা প্রায় তিন দশক ধরে চলে আসছে। বিসিএস তথ্য ক্যাডারের কর্মকর্তারাও তাদের পেশাগত ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধির স্বার্থে একটি তথ্য ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি দীর্ঘদিন যাবৎ অনুভব করে আসছিলেন। বর্তমান সরকার বিষয়টি অনুধাবন করে এ বিষয়ে একটি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। দপ্তর তিনটিকে আধুনিক ও প্রযুক্তিগত সুবিধা সংবলিত একটি ভবনে নিয়ে আসার লক্ষ্যে তথ্য ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হয়। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের নিজস্ব জমিতে ৩৮.৬৪ কাঠা জমির ওপর ২ লক্ষ বর্গফুট আয়তনের ১৬ তলা তথ্য ভবন নির্মাণ শুরু হয় ২০১৫ সালে। একই সাথে তথ্য ভবনের দক্ষিণ পাশে ৮ হাজার বর্গফুট আয়তনের ৩ তলা এনেক্স ভবন নির্মাণ করা হয়। যেখানে একটি বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন, পাম্প হাউজ, অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ, ক্যান্টিন এবং নামাজের স্থান রাখা হয়েছে। এছাড়াও তথ্য ভবনের পূর্বদিকে প্রায় ১১ হাজার বর্গফুট আয়তনের ওয়াকওয়ে বেষ্টিত একটি দৃষ্টিনন্দন পুকুর পুনঃখনন করা হয়েছে।

১৬ তলা তথ্য ভবন

এরিয়াল ভিউ

একনজরে তথ্য ভবন নির্মাণ প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	:	তথ্য ভবন নির্মাণ প্রকল্প (১৬ তলা তথ্য ভবন নির্মাণ)
বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় ও দপ্তর	:	তথ্য মন্ত্রণালয়, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
নির্মাণ সংশ্লিষ্ট দপ্তর	:	গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর
সুবিধাভোগী/ব্যবহার প্রত্যাশী দপ্তর	:	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড
প্রকল্প পরিচালক	:	মো. মনিরুজ্জামান, পরিচালক (বিসিএস তথ্য–সাধারণ)
প্রকল্পে জমির পরিমাণ	:	৬৩.৮৭ শতাংশ (৩৮.৬৪ কাঠা)।
ফ্লোরের সংখ্যা ও মোট আয়তন	:	১৬ তলা (আন্ডারগ্রাউন্ড পার্কিং ছাড়া), ২ লক্ষ ৮ হাজার বর্গফুট (তিন তলা এনেক্স ভবনসহ)
প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	● চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ ফিল্ম সেন্সর বোর্ড-এর দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্থান সংকুলান করা এবং এই তিনটি দপ্তরকে ব্যয় সাশ্রয় পন্থায় একই স্থানে নিয়ে আসা। ● জনসেবার জন্য অধিকতর সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা। ● কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার মাধ্যমে দ্রুত কার্যকর মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের মাধ্যমে সরকারকে সহায়তা করা। ● তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ও চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের মধ্যে সমন্বয় জোরদারকরণ। ● সরকারি জমি ও যন্ত্রপাতির সর্বাধিক ব্যবহার এবং কেপিআই প্রতিষ্ঠান হিসেবে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর-এর নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
ভবনের মূল ফিচার	:	চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড-এর চাহিদা এবং অর্গানোগ্রাম অনুসারে অফিস স্পেস, প্রোডাকশন হাউজ, এডিটিং প্যানেল, চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও প্রচার কাজ সহায়ক কমন সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত করে তথ্য ভবনের স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন করা হয়েছে। এখানে তিনটি দপ্তরের জন্য অফিস স্পেস, একাধিক ফিল্ম প্রজেকশন হল, পোস্ট প্রোডাকশন ও স্যুটিং স্টুডিও, একাধিক মাল্টিপারপাস হল, মিউজিয়াম, ডিসপ্লে গ্যালারি, ডরমিটরি, প্রত্যেক দপ্তরের জন্য কনফারেন্স কক্ষ, কমন কনফারেন্স হল, সেন্সর বোর্ডের জন্য জুরি বোর্ড মিটিং রুম, একাধিক রিহার্সেল ও রেকর্ডিং কক্ষ, পুস্তক লাইব্রেরি, ফিল্ম লাইব্রেরি, ফিল্ম স্টোর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের অত্যাধুনিক ইকুইপমেন্ট স্টোর, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের পাবলিকেশন স্টোর, সকল দপ্তরের স্টেশনারি স্টোর, জেনারেটর ওয়ার্কশপ, ইলেক্ট্রনিক্স ওয়ার্কশপ এবং ডে-কেয়ার সেন্টার থাকবে। তথ্য ভবনে সোলার প্যানেল, ভূমিকম্প সহনীয় ও বজ্রনিরোধক এবং অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়াও তথ্য ভবন সংলগ্ন তিন তলা এনেক্স ভবনে ১৬০০ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন, গভীর নলকূপ, অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ, ক্যান্টিন এবং নামাজের স্থান রাখা হয়েছে। তাছাড়া তথ্য ভবনের পূর্ব পাশে ওয়াকওয়ে বেষ্টিত একটি দৃষ্টিনন্দন পুকুর পুনঃখনন করা হয়েছে।

মূল প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদন	:	২৯শে অক্টোবর ২০১৩
প্রশাসনিক আদেশ জারি	:	২০শে ফেব্রুয়ারি ২০১৪
প্রাক্কলিত ব্যয় (জিওবি)	:	৬০৭৩.৬৫ লক্ষ টাকা
বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত
প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন	:	১২ই আগস্ট ২০১৫
সংশোধিত প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদন	:	১০ই জানুয়ারি ২০১৭
প্রশাসনিক আদেশ জারি	:	১৬ই ফেব্রুয়ারি ২০১৭
সংশোধিত প্রাক্কলিত ব্যয় (জিওবি)	:	৯৫৮৫.৩৯ লক্ষ টাকা
সংশোধিত মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের বর্তমান মেয়াদ	:	জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৯
নির্মাণ কাজের মূল ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান	:	বঙ্গ বিল্ডার্স লি., ঢাকা

পুকুরসহ পেছনের দৃশ্য

তথ্য ভবনের স্থাপত্য নকশা

প্রকল্প নির্মাণ ব্যয়

তথ্য ভবন নির্মাণ প্রকল্পটি ৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৬ পর্যন্ত ৩ বছর মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ২৯শে অক্টোবর ২০১৩ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ৯ই ফেব্রুয়ারি ২০১৪ অনুমোদন সম্পর্কিত জিও জারি হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধিত আকারে ৯৬ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৩ থেকে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১০ই জানুয়ারি ২০১৭ একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। ১৬ই ফেব্রুয়ারি ২০১৭ সংশোধিত প্রকল্পটির অনুকূলে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়। ইতোমধ্যে বাস্তব প্রয়োজনে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ আরো এক বছর অর্থাৎ জুন ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।

কী কী থাকছে এ ভবনে

নবনির্মিত এ তথ্য ভবন একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ও বিনোদন কেন্দ্র হিসেবেও অবদান রাখবে। এই ভবনে কিছু কমন সুবিধা যেমন– চলচ্চিত্র বিষয়ক লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র, মিউজিয়াম, ডিসপ্লে গ্যালারি ছাড়াও একাধিক কনফারেন্স কক্ষ, মাল্টিপারপাস হল, চলচ্চিত্র প্রদর্শন কক্ষ, ডে-কেয়ার সেন্টার, ডরমিটরি ও লাইব্রেরি থাকবে। সর্বোপরি এই ভবনে একটি ডিজিটাল তথ্য ভাণ্ডার থাকবে। যার মাধ্যমে বিশ্বের যে-কোনো প্রান্ত থেকে কোনো ব্যক্তি দপ্তর তিনটির নাগরিক সেবা প্রদান সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন এবং প্রামাণ্যচিত্র, ডকুড্রামা, ফিচার ফিল্ম, টিভি ফিলার কিংবা নিয়মিত ও অ্যাডহক প্রকাশনাসমূহ ইন্টারনেটের মাধ্যমে দেখতে ও সংগ্রহ করতে পারবেন। আশা করা যায়, তথ্য ভবন সরকারের প্রচার কাজের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে গণপূর্ত অধিদপ্তর এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)। এর স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন করেছে স্থাপত্য অধিদপ্তর।

তথ্য ভবনের প্রবেশপথ

কনফারেন্স হল

তিনটি দপ্তর যেভাবে উপকৃত হবে

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর

তথ্য ভবন নির্মাণের ফলে এ অধিদপ্তরের সাড়ে তিনশ কর্মকর্তা-কর্মচারীর স্থান সংকুলান হবে এবং কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকবে। তাছাড়া বিশালায়তনের কনফারেন্স হল, অত্যাধুনিক রিহার্সেল ও ডিজিটাল রেকর্ডিং কক্ষ, আধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন পোস্ট প্রডাকশন ও স্যুটিং স্টুডিও, মাল্টিপারপাস হল, মিউজিয়াম, ডিসপ্লে গ্যালারি ইত্যাদি এ অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করবে এবং সরকারি অর্থ সাশ্রয় করবে। দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণকে সম্পৃক্ত করার কাজে তথ্য ভবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার পাশাপাশি জনসেবা প্রদানে কার্যকর অবদান রাখবে।

গণযোগাযোগ অধিদপ্তর

এতদিন এ অধিদপ্তরের নিজস্ব কোনো ভবন ছিল না। ভাড়া বাসায় অত্যন্ত সংকীর্ণ পরিসরে এ অধিদপ্তরের কার্যক্রম নির্বাহ হয়ে আসছিল। তথ্য ভবনের সুবিশাল পরিসরে এ অধিদপ্তর স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে দাপ্তরিক কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ২৬০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ পাবে। তাছাড়া কনফারেন্স হল, মিটিং রুম, ইকুইপমেন্ট স্টোর, জেনারেটর ও ইলেক্ট্রনিক্স ওয়ার্কশপ, অটোমোবাইল ওয়ার্কশপের সুবিধাসহ উন্নত প্রযুক্তি ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত তথ্য ভবন তৃণমূল পর্যায়ে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রচারণা কার্যক্রমকে আরো বেগবান করবে। সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের সাথে এ অধিদপ্তরের যোগাযোগ ও সমন্বয় অধিকতর দ্রুত ও কার্যকর হবে।

এট্রিয়াম: রিসিপশন লবি লাউঞ্জ

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড

সীমিত পরিসরে ভাড়া বাসায় পরিচালিত এ দপ্তর আধুনিক ও ডিজিটাল সুযোগ-সুবিধা সংবলিত তথ্য ভবনে স্থানান্তরিত হওয়ার ফলে একদিকে যেমন ৪০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসবে অপরদিকে তেমনি এর কার্যক্রম গতিশীলতা লাভ করবে। জুরি বোর্ড মিটিং রুম, প্রজেকশন হল, কনফারেন্স হলসহ অন্যান্য প্রযুক্তিগত সুবিধা দেশীয় চলচ্চিত্রের সুস্থ ধারা অব্যাহত রাখার পাশাপাশি আধুনিক মানসম্পন্ন চলচ্চিত্র বিকাশে উৎসাহিত করতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

তথ্য ভবন ব্যবহার প্রত্যাশী তিনটি দপ্তর চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ সেন্সর বোর্ড সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের প্রিন্ট ও অডিও-ভিজুয়্যাল প্রোডাকশন হাউজ ও সংরক্ষণাগার এবং দেশ-বিদেশে প্রচার মুখপাত্র হিসেবে কাজ করছে। দেশের ভেতরে এবং বহির্বিশ্বে জনকল্যাণে গৃহীত সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির

সভাকক্ষ

পিতার জীবন ও কর্মভিত্তিক প্রকাশনা ও চলচ্চিত্র নির্মাণসহ দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধারণ, বিকাশ ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ ভবনের কার্যক্রম পুরোপুরি শুরু হবে ২০১৯ সালের ১লা জুলাই থেকে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

এ আধুনিক তথ্য ভবনকে ঘিরে অনেক চিন্তাভাবনা রয়েছে, যা সময় ও সুযোগমতো বাস্তবায়ন করা যাবে। এরমধ্যে রয়েছে টিভি-রেডিও স্টেশন নির্মাণ, যেখান থেকে অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রচার কার্যক্রম চালানো হবে এবং গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সম্প্রচারের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করবে। তাছাড়া প্রি-প্রেস প্রোডাকশন ইউনিট স্থাপন– যেখান থেকে কোনো প্রকাশনা মুদ্রণের পূর্বে কম্পোজ, লে-আউট ও ডিজাইন তৈরির কাজটি সম্পন্ন করা হবে। এগুলো ছাড়াও এ ভবনটিকে একটি আধুনিক তথ্যভাণ্ডার হিসেবে গড়ে তোলা হবে, যেখান থেকে সারাদেশের মানুষ এবং বিদেশ থেকেও অনলাইন এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যে-কোনো ধরনের তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন।

লেখক: প্রকল্প পরিচালক, তথ্য ভবন নির্মাণ প্রকল্প

হিজড়া: তাদের সম্পর্কে আমরা কতটুকু জানি

ড. মোহাম্মদ হাননান

প্রথমত, 'হিজড়া' মানব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের অভাব রয়েছে। এ মানব সম্প্রদায় সম্পর্কে আমাদের নেতিবাচক ধারণাও রয়েছে। ফলে সমাজে অতি কাছে থেকেও হিজড়াদের সম্পর্কে আমাদের আগ্রহের কমতি পরিলক্ষিত হয়। বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান বলছে, 'হিজড়া' শব্দটি হিন্দি ভাষা থেকে এসেছে। হিজড়া বিষয়ক একজন গবেষক বলেছেন, 'হিজড়া' শব্দ এসেছে ফারসি থেকে। [ড. জোবাইদা নাসরীন: 'আমাদেরই বুঝদার হতে হবে', *আমাদের সময়*, ঢাকার দৈনিক পত্রিকা, ৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৮]।

বিকলাঙ্গ। ইসলামি শরিয়া অনুযায়ী হিজড়া হচ্ছে সে, যার পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ উভয়টিই রয়েছে অথবা কোনোটিই নেই। শুধু প্রস্রাবের জন্য একটি ছিদ্রপথ রয়েছে। একই দেহে স্ত্রী ও পুরুষ চিহ্নযুক্ত অথবা এই উভয় চিহ্নযুক্ত মানুষটি হলো হিজড়া। [সূত্র : মাওলানা ইসমাঈল মাহমুদ : 'প্রসঙ্গ হিজড়া : ইসলামী দৃষ্টিকোণ', *বাতায়ন*, ইসলামী গবেষণা সাময়িকী, বসিলা, ঢাকা, মে ২০১৫ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৭৬]।

সবচেয়ে ভালো হয়, আমরা যদি তাকে 'লিঙ্গ প্রতিবন্ধী' বলি। সব মানুষই নিখুঁত নয়, কারো হাত নেই, কারো পা নেই, কেউ চোখে কম দেখে, কেউ কানে শোনেই না, কেউ কথা বলতে পারে না, কারো বুদ্ধি কম। এদের আমরা প্রতিবন্ধী বলি। হিজড়ারাও এক ধরনের প্রতিবন্ধী, তারা লিঙ্গ প্রতিবন্ধী।

তবে এর মধ্যেও আমরা হিজড়াদের নারী-পুরুষ ভেদ করতে পারি। অনেক হিজড়ার দাড়ি, গোঁফ গজায়, অনেকেই নারী সহবাসে সক্ষম, অনেকেরই স্বপ্নদোষ জাতীয় পুরুষ-প্রকৃতি প্রকাশিত হয়। এদের আমরা সহজেই পুরুষ শ্রেণির হিজড়ার মধ্যে ফেলতে পারি।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৮ সালের কোরবানির ঈদে হিজড়াদের জন্য কোরবানির গরু পাঠিয়েছিলেন। ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০১৮ জাতীয় সংসদ কার্যালয়ে হিজড়া সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানান

আমরিন খান বলেছেন, ফারসি ভাষায় 'হিজড়া' অর্থ হলো 'সম্মানিত ব্যক্তি'। [মানবাধিকার বাংলাদেশ ২০১৪, আইন ও সালিশ কেন্দ্র থেকে প্রকাশিত আমরিন খানের প্রবন্ধ 'যৌনগত সংখ্যালঘুর অধিকার']। তবে যে ভাষা থেকেই শব্দটি আসুক না কেন, হিজড়ার আরো অনেক সমার্থক ও পারিভাষিক শব্দ আমাদের সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ছড়িয়ে আছে। যেমন–শিখণ্ডী, খোঁজা, বৃহন্নলা, তৃতীয় লিঙ্গ, উভয় লিঙ্গ, নপুংসক, ইংরেজি ভাষায় ট্রান্সজেন্ডার, হার্মফ্রোডাইট, হিব্রু ভাষায় ইউনাক, আরবি ভাষায় খুনসা ইত্যাদি।

প্রকৃতপক্ষে হিজড়া নারী-পুরুষের বাইরে আরেকটি লিঙ্গ বৈচিত্র্যের মানবধারা। যৌনবৈচিত্র্যের ভিত্তিতে আমরা ছয় ধরনের হিজড়ার অস্তিত্ব সমাজে দেখতে পাই। হিজড়া মানববিশেষ লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকশিত হয়, তার লিঙ্গ অনুপযোগী। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার কিছু হিজড়ার মধ্যে স্তন প্রকাশিত হয়, তাদের ঋতুস্রাবও হয়, সহবাসে উপযোগী থাকে, গর্ভ সঞ্চারিত হওয়ার মতোও নারী-প্রকৃতি সমানভাবে প্রকাশিত হয়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা হিজড়া বিষয়টিকে মানুষের জেনেটিক সমস্যা বলে অভিহিত করেছেন। [ডা. আবদুল ওয়াদুদ, *যুগান্তর*, ঢাকার দৈনিক, ২১শে ডিসেম্বর ২০১২]।

তবে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ মনে করেন, লিঙ্গীয় ভিন্নতা আসলে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অংশ নয়। [ডা. জোবাইদা নাসরীন, পূর্বোক্ত সূত্র]।

নারীর দেহে হরমোনের অসামঞ্জস্যতার কারণে হিজড়া সন্তান জন্মের একটি বড়ো কারণ। অনেক সময় জন্মের পরও হরমোনের তারতম্যের কারণে নারী-পুরুষ প্রকৃতির মাঝখানে তৃতীয় আরেকটি লিঙ্গের সৃষ্টি হতে পারে। শিশু বয়সে যৌন নিপীড়নের শিকার হলেও কেউ হিজড়া

জাতীয় পতাকা হাতে হিজড়াদের একজন

হয়ে যেতে পারে। কোনো সময় আতঙ্ক থেকেও মানুষ নিজেকে অপর লিঙ্গের মতো ভাবতে থাকে।

এই অন্য লিঙ্গের মতো ভাবতে পারা যদি নারী-প্রকৃতি হয়ে ওঠে, তখন হিজড়া একটা সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা এইডস ও অন্যান্য যৌনবাহী রোগের ধারক হিসেবে পতিতার মতো হিজড়াদেরও গুণে থাকেন। বিশেষ করে নারী প্রকৃতির হিজড়ারা এক্ষেত্রে প্রধান সন্দেহের তালিকায় থাকে।

অথচ বাংলাদেশে হিজড়াদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। যদিও হিজড়ারা মনে করে, সারাদেশে হিজড়া সম্প্রদায়ের সংখ্যা দেড় লাখ। রাজধানী ঢাকায় আছে ১৫ হাজারের মতো হিজড়া। [*প্রথম আলো*, ঢাকার দৈনিক, ৩১শে আগস্ট ২০১৩]। অন্য একটি সংবাদপত্র জানিয়েছে, সারাদেশে হিজড়াদের সংখ্যা ১০ থেকে ১৫ হাজারের মতো। কিন্তু ডেমোগ্রাফি সূত্র অনুযায়ী, ঢাকায় হিজড়ার সংখ্যা ২৫ হাজারের মতো। [*যুগান্তর*, ২১শে ডিসেম্বর ২০১২]।

হিজড়ারা কেন নারীরূপ সাজতে ভালোবাসে? প্রকৃতপক্ষে মানব-প্রকৃতির সবাই সাজতে ভালোবাসে। মেয়েরা একটু বেশি সেজে থাকে। হিজড়া নারী-প্রকৃতি বা পুরুষ-প্রকৃতি যা-ই হোক সবাই দল ধরেই সাজগোজ করতে ভালোবাসে। এমনিতে হিজড়াদের একটা অংশ ভিক্ষাবৃত্তি, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, বখশিশ তোলা ইত্যাদি সামাজিক অপকর্মে রত আছে। এ কাজগুলো নারী সেজে করলে সুবিধা বেশি হয়ে থাকে বলে তাদের মনে একটা সুবিধাবাদ কাজ করে। যেহেতু আমাদের দেশে নারীরা এসব বৃত্তি ও পেশা বেছে নেয় না, সেহেতু হিজড়ারা সুযোগটি গ্রহণ করে। এতে প্রকৃতপক্ষে 'নারীসমাজ' অপমানিত হয়। হিজড়াদের নিয়ে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হওয়ার এটি একটি বড়ো কারণ। এসব প্রতারণামূলক কাজ পছন্দ করে না এমন হিজড়াও সমাজে আছে। সমাজে প্রতিষ্ঠিত, শিক্ষিত হিজড়ারা এসব থেকে মুক্ত।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ সরকার একটি সুন্দর হিজড়াসমাজ গড়ে তোলার জন্য নানা প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশ সমাজসেবা অধিদপ্তর ২০১২ সাল থেকে হিজড়া শিশুদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি চালু করেছে। বাংলাদেশ আইন কমিশন সুপারিশকৃত 'বৈষম্য বিলোপ আইন ২০১৪' প্রণয়ন করেছে। জাতীয় সংসদেও তা গুরুত্ব পেয়েছে। এ আইনের ৪ নম্বর ধারা ও উপধারায় লিঙ্গ প্রতিবন্ধীদের জন্ম, পরিবার, উত্তরাধিকার বিষয়ে বৈষম্য বিলোপ করার কথা উল্লিখিত হয়েছে। সংবিধানের ১৯, ২৭, ২৮, ২৯ অনুচ্ছেদেও সব নাগরিকের সমতা, সমান সুযোগ ও সব ধরনের বৈষম্য বিলোপের বিধানাবলি লিপিবদ্ধ রয়েছে। মনে রাখতে হবে, হিজড়ারা পুরুষ নাকি নারী, এ প্রশ্নের উত্তরের চেয়েও জরুরি হলো তারা মানুষ। আমাদের সভ্য সমাজের মতোই মানবমণ্ডলী তারা। সুতরাং সব মৌলিক অধিকার তাকে দিতে হবে। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হিজড়াদের জন্য পঞ্চাশের বেশি বেসরকারি সংস্থা ও সংগঠন রয়েছে। তাদেরও রয়েছে নানারকম প্রকল্প ও কর্মসূচি। সরকারি উদ্যোগের সঙ্গে মিলে এসব সংস্থা ও সংগঠন বাস্তবসম্মত কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সমাজসেবা কমপ্লেক্সে ২০১৬ সালে হিজড়াদের রূপচর্চা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যাতে তারা বিউটি পার্লার ব্যবসাটা করতে পারে। [সূত্র : *কালের কণ্ঠ*, ঢাকার দৈনিক, ১৪ই জুলাই ২০১৬]।

আমরা আগেই বলেছি, হিজড়া সম্প্রদায়ের সদস্যরা নারী পরিচয় দিতে বেশি ভালোবাসে এবং সাজগোজ করা তাদের প্রধান শখ। সুতরাং আমরা বলতে পারি, নারী হিজড়াদের জন্য এ কার্যক্রম বাস্তবমুখী।

২০১৫ সালের ৩০শে মার্চ ঢাকার বেগুনবাড়িতে যখন একদল জঙ্গি একজনকে হত্যা করে দৌড়ে পালাচ্ছিল, সাধারণ মানুষ যখন দর্শকের মতো উৎসুক হয়ে ঘটনাটি দেখছিল, তখন একজন হিজড়া দুজন জঙ্গিকে ধরে ফেলে। এ নিয়ে সারাদেশ উৎফুল্লে ফেটে পড়েছিল। সে ছিল একজন নারী হিজড়া, নাম ছিল তার লাবণ্য।

এ প্রেক্ষাপটে প্রশাসন তাদের অধিকতর কাজে লাগাতে উদ্যোগী হয়। কেউ কেউ ট্রাফিক পুলিশের চাকরিও পায়। আমাদের সুপারিশ, নারী হিজড়াদের আনসার ও ভিডিপিতেও নেওয়া যায়, কারণ সেখানে প্রচুর পরিমাণে নারী আনসার ও ভিডিপি রয়েছে।

বাংলাদেশে প্রচুর হিজড়া আছে, যারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিয়েছে। তাদের হিজড়া পুনর্বাসনে কাজে লাগানো যায়। ভারতের বাংলা প্রদেশের কৃষ্ণনগর কলেজের অধ্যক্ষ মানবী বন্দ্যোপাধ্যায় একজন নারী হিজড়া। [মাহমুদুজ্জামান বাবু : আজন্ম পাপ এবং হলদে গোলাপ, *প্রথম আলো*, ১৪ই ফেব্রুয়ারি ২০১৬]

হিজড়াদের জন্য আবাসন প্রকল্প চালু করলে একটি নতুন সম্ভাবনা তাদের জীবনে জেগে উঠবে। তাদের চিকিৎসা সুবিধা দিতে হবে অন্য প্রতিবন্ধীদের মতোই বিনামূল্যে, আর এতে নারী হিজড়াদের অগ্রাধিকার দেওয়া জরুরি। তাদের সুস্থ বিনোদনে নিয়ে আসতে হবে, যাতে নারী হিজড়াদের অবৈধ কাজে কেউ ব্যবহার করতে না পারে।

হিজড়ারা যাতে সাধারণ মানুষের ওপর জুলুম না করে, তার জন্য তাদের আদবকায়দা প্রশিক্ষণও দেওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে একটি অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন একজন প্রতিবেদক। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় প্রশিক্ষণে কোনো কর্মকর্তা অধিবেশনে প্রবেশ করলেই হিজড়ারা বলে উঠত–'এই বেডা কেডা।' প্রশিক্ষণের কয়েক দিনের মধ্যেই প্রশিক্ষককে তারা বলতে শুরু করে, 'স্যার।' [সূত্র: *কালের কণ্ঠ*, ১৪ই জুলাই ২০১৬]। এভাবে তাদেরও পরিবর্তন সম্ভব, সেটি যে-কোনো বিষয়েই হোক।

আরেকটি ঘটনা লক্ষ করুন। মিয়ানমারে যখন রোহিঙ্গাদের গণহারে হত্যা করা হচ্ছিল, তখন ঢাকায় হিজড়া সম্প্রদায় প্রতিবাদ মিছিল করে। কয়েকশ হিজড়া মিছিল করে এবং মানববন্ধনও করে। এ সময় বক্তৃতা করেন আনোরি হিজড়া, রূপা হিজড়া, নাসিমা হিজড়া, সুইটি হিজড়া, সীমা হিজড়া। দেখুন, এরা সবাই নারী। তারা সবাই বাংলাদেশ সরকারের কাছে সীমান্ত খুলে দেওয়ার আহ্বানও

জানিয়েছিল। [বিস্তারিত প্রতিবেদন দেখুন, *আমাদের সময়*, অনলাইন সংস্করণ, ২৭শে নভেম্বর ২০১৬]। হিজড়ারা যে কত সচেতন নাগরিক, এসব ঘটনা আমাদের চোখ খুলে দেয়।

২০১৩ সালের ১১ই নভেম্বর বাংলাদেশ মন্ত্রিসভা তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে হিজড়াদের স্বীকৃতি দেয়। ২০০৮ সাল থেকেই বাংলাদেশে হিজড়ারা ভোটার। তাদের এ রাজনৈতিক অধিকার রাষ্ট্র মেনে নিয়েছে। আমাদের দেশে তাই নারী আছে, পুরুষ আছে, তৃতীয় লিঙ্গও আছে। মুসলিম শরিয়া আইন অনুযায়ী হিজড়ারা মা-বাবার সম্পত্তির ভাগ পাবে। তাদের বঞ্চিত করা আইনের বরখেলাপ হবে। তবে তারা উত্তরাধিকার সম্পদে নারী হিসেবে পাবে নাকি পুরুষ হিসেবে পাবে, তা-ও শরিয়ায় নিশ্চিত করা আছে। যে হিজড়া নারী বা পুরুষ প্রকৃতির, সে নারী বা পুরুষের মানদণ্ডেই উত্তরাধিকার সম্পদ পাবে, আর যে নারী নাকি পুরুষ, এর কোনোটিই চিহ্নিত করা যায় না, সে তার প্রস্রাবের পথের অবস্থা অনুযায়ী ভাগ পাবে। [সূত্র: *সুনানে বায়হাকি*, হাদিস নম্বর: ১২২৯৪]।

শাম্মী পার্লারের ব্যবসাকে বেছে নিয়েছেন জীবিকা হিসেবে

'নপুংসক' অর্থ ধরে কাউকে 'হিজড়া' বলে গালি দেওয়া যাবে না। কাউকে 'মন্দ নামে ডাকা গুনাহ'। [*পবিত্র কোরান*, সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১১]। মনে রাখতে হবে, যারা লিঙ্গ প্রতিবন্ধী, তারা আমাদের সভ্য সমাজেরই কারো না কারো সন্তান। আগে আমাদের দেশে শারীরিক অন্য প্রতিবন্ধীদের বোঝা মনে করা হতো, এখন এরা গর্ব এবং মর্যাদার সঙ্গে বড়ো হচ্ছে।

লিঙ্গ প্রতিবন্ধীরাও ঠিক এমনই একটি ধারা, তাদেরও মর্যাদার সঙ্গে বসবাস করতে দিতে হবে। পরিবারের অন্য সদস্যদের মতোই তারা বড়ো হবে, শিক্ষা লাভ করবে, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে। তাদের নিয়ে একসঙ্গে চলতে সমাজে লজ্জার কিছু নেই। আমাদের নবি সা. যখন আরব ভূমিতে আগমন করেন, তখন আরবের ঘরগুলোতে কন্যাসন্তান জন্ম নেওয়া লজ্জার ছিল। কিন্তু ইসলাম যখন কন্যাসন্তানের মর্যাদা ঘোষণা করল, তখন কন্যাসন্তানই সমাজে হয়ে উঠল মর্যাদাশালী। লিঙ্গ প্রতিবন্ধিতা নিয়ে জন্মানোয় লজ্জার কিছু নেই, তাকে সুষ্ঠুভাবে, আলাদা যত্ন নিয়ে লালনপালন করাই হবে গৌরবের। শিশু লিঙ্গ প্রতিবন্ধীকে প্রাথমিক অবস্থায় চিকিৎসা দিলে তার প্রতিবন্ধিতা সেরে ওঠার সম্ভাবনাই বেশি থাকে। সুতরাং এদিকটাও দেখতে হবে।

সবশেষে একজন হিজড়ার গল্প দিয়ে লেখাটা শেষ করছি। একজন নারী হিজড়া ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়েছে এমন করে: 'আমি যে মায়ের গর্ভে জন্মেছিলাম, তার কাছে আমি থাকতে পারিনি কিংবা সে আমাকে রাখতে পারেনি। আমার জরায়ু নেই; কিন্তু আমার একটি মেয়ে আছে। সুতরাং মা হতে হলে জরায়ু থাকতে হবে এমন কথা নেই'। [ড. জোবাইদা নাসরীন তাঁর বন্ধু এক নারী হিজড়ার স্ট্যাটাসটি উদ্ধৃত করেছেন, দেখুন, আমাদের সময়, ৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৮]। এ ঘটনাটি হিজড়াদের সম্পর্কে আমাদের মনের চোখ খুলে দিতে যথেষ্ট। আশা করি, হিজড়া সম্পর্কে আমাদের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হবে।

এর সঙ্গে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমরা যদি সচেতন থাকি, তাহলে হিজড়াদের জীবন আরো সুন্দর হয়ে উঠবে। মনে রাখতে হবে, এ বিশ্বজগৎ একমাত্র আল্লাহ তায়ালারই খেয়াল-খুশি অনুযায়ী চলছে। 'আল্লাহ, তিনি যা ইচ্ছা, যেমন করে ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। [পবিত্র কোরান–সূরা: শুরা, আয়াত: ৪৯]।

তবে আল্লাহর সব ধরনের ইচ্ছা ও খেয়ালের পেছনে হেকমত ও তাৎপর্য আছে। তিনি এমনি এমনি সব ইচ্ছা বাস্তবায়ন করেননি। তিনি একজনকে চোখ দেননি, এটা চোখওয়ালার জন্য একটি শিক্ষা, আল্লাহ বলছেন, তোমাকে আমি চোখ দিয়েছি, তুমি আমার সৃষ্টির সৌন্দর্য দেখতে পারছ; কিন্তু যে দেখতে পারে না তার কথা ভেবে দেখো, আমি তোমাকে কত করুণা করেছি।

তেমনি আল্লাহ তায়ালা একজনকে লিঙ্গ দেননি, আবার আরেকজনকে দিয়েছেন। যাকে দিয়েছেন, সে যেন তার লিঙ্গকে বৈধ পথে ব্যবহার করে, জেনা থেকে বেঁচে থাকে। আর ভাবে, আমাকেও তো আল্লাহ লিঙ্গহীন করে বানাতে পারতেন। তাই এ দুনিয়ার সামান্য থেকে সামান্য, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র কিছুর সৃষ্টিও মহান আল্লাহর হেকমতের বাইরে নয়। 'তিনিই মহান সত্তা, যিনি মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী এবং প্রজ্ঞাময়'। [*পবিত্র কোরান*, সূরা: আলে ইমরান, আয়াত: ৬]।

আল্লাহ তায়ালার কাছেও তাই বাহ্যিক আকার-আকৃতির কোনো মূল্য নেই। কারণ এ আকৃতি তার নিজের ইচ্ছায়ই হয়েছে, মানুষের এতে কোনো হাত নেই। হাশরের ময়দানে তিনি দেখবেন শুধু মানুষের আমল। [*মুসলিম শরিফ*, হাদিস নম্বর ৬৭০৮]।

তাই সাধারণ সুস্থ মানুষের জন্য যেমন, তেমনি লিঙ্গপ্রতিবন্ধীর জন্যও আল্লাহর হুকুম জানা ও রসুল (সা.)-এর তরিকা অনুযায়ী তা মানা তার জন্য জরুরি। বাংলাদেশের বেশির ভাগ হিজড়া মুসলিম। কারণ মুসলিম অধ্যুষিত এ দেশের কোনো না কোনো মুসলিম পিতা-মাতার ঘরেই তাদের জন্ম হয়েছে। তাই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামি রীতিনীতিই তাঁকে মেনে চলতে হবে। কিন্তু একটি গোষ্ঠী হিজড়াদের ইসলাম বহির্ভূত কর্মকাণ্ডে লিপ্ত করে রাখছে। যা বেদনাদায়ক। একজন হিজড়ার মৃত্যু হলে তাকে কবর দেওয়া হয় ঠিকই; কিন্তু প্রচলিত মুসলিম সমাজের মতো নয়। সে যে বিছানায় ঘুমাত, তার নিচেই তাকে কবর দেওয়া হয়। ইদানীং জায়গার অভাবে অন্যত্র কবর দেওয়া হয় বটে; কিন্তু অন্যান্য কার্যক্রম হয়

ইসলামবিরোধী ভাবধারায়। কবরে প্রথম লবণ দেওয়া হয়, পরে লাশ রাখা হয়। এরপর দেওয়া হয় ফুল, তারপর আবার লবণ। এরপর সবাই মিলে লাশটিকে জুতাপেটা করতে থাকে। [*সমকাল*, ঢাকা, ২০শে মার্চ ২০১৫]।

পুরো প্রক্রিয়াটিই নিষ্ঠুর, হাস্যকর ও ইসলামবিরোধী এক কর্মকাণ্ড। বর্তমানে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার লোভে অনেক সুস্থ মানুষও হিজড়া সেজে থাকে। সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকারের একটি চাকরিতে হিজড়া কোটা থাকায় অনেক তরুণ-যুবক হিজড়া হিসেবে নিজেদের নাম লেখায়। কর্তৃপক্ষের সন্দেহ হওয়ায় তাদের ডাক্তারি পরীক্ষা করে দেখা যায়, তারা সবাই সুস্থ। ইদানীং আরেকটি ঘটনা সংক্রমণ হচ্ছে, আর তা হলো– অনেক প্রাইভেট হাসপাতাল তরুণ-যুবকদের অস্ত্রোপচার করে লিঙ্গ কর্তন করে দিচ্ছে। অনেককে ওষুধ খাইয়েও হিজড়া বানানোর চেষ্টা চলে। ভারতে এ ধরনের বহু প্রতিষ্ঠান আছে, এখন তা বাংলাদেশেও আমদানি হচ্ছে। অথচ আমাদের নবি সা. ওইসব পুরুষের ওপর অভিশাপ দিয়েছেন, যারা নারীদের

হিজড়াদের পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে নিয়োগ করেছে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

সাদৃশ্য অবলম্বন করে এবং ওইসব নারীর ওপরও অভিশাপ করেছেন, যারা পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করে এবং মহান আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত করে। [*বুখারি শরিফ*, হাদিস নম্বর: ৩৮৮৫]।

বাংলাদেশের পেনাল কোড ৩২৬ ধারায়ও অঙ্গহানি ও রূপান্তর শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে ঘোষিত হয়েছে। ইসলাম ছাড়া অন্যান্য বিশ্বাস ও বাতিল মতবাদেও হিজড়াদের প্রসঙ্গে নানা কথা দেখতে পাওয়া যায়। এদের 'তৃতীয় প্রকৃতি' বলে অভিহিত করা হয়েছে। কোনো কোনো প্রাচীন গোত্রে এদের আলাদা দেবতা রয়েছে। পূর্ব সময় থেকেই মন্দিরে হিজড়া নাচের ব্যবস্থা ছিল। বৌদ্ধ মতবাদে যেসব পুরুষ মেয়েদের মতো আচরণ করে, তাদের 'কতি' বলা হয়েছে। বৌদ্ধ অধ্যুষিত থাইল্যান্ডে কতিদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ। তবে হিজড়া নারী ইউরোপীয়দের বিয়ে করতে পারবে, কিন্তু তাকে তখন থাইল্যান্ড থেকে চলে যেতে হবে। [Home sexuality in Buddhism, Matzner, Andrew, 200, *বাতায়ন*, মে ২০১৫ সংখ্যা, মাহাদুল বুহুসিল ইসলামিয়া, বাসলা'র গবেষণাপত্র থেকে উদ্ধৃত]। ইহুদিরা হিজড়াদের ধর্ম বহির্ভূত মানুষ বলে মনে করে। তাদের বলা হয় 'সারিম'। তবে সারিমরা যদি রোজা রাখে, তাহলে জান্নাতে তাদের জন্য উঁচু স্তম্ভ তৈরি করা হবে। [সূত্র: *বাতায়ন*, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৮৬]। খ্রিষ্টানরা সব সময়ই হিজড়াদের তৃতীয় লিঙ্গ বলে অভিহিত করে আসছে। এটা ভারতের পৌত্তলিক বিশ্বাসীদের 'তৃতীয় প্রকৃতি'র কাছাকাছি।

শুধু ইসলামই হিজড়াদের পূর্ণাঙ্গ মানুষ মনে করে। পবিত্র কোরান ও হাদিসে অঙ্গ ও আকৃতির ভিত্তিতে মানুষকে ভাগ করা হয়নি। আল্লাহ তায়ালার কাছে সব ত্রুটিহীন অথবা ত্রুটিপূর্ণ মানুষই সমান এবং হাশরের ময়দানে সব ধরনের মানুষই জিজ্ঞাসিত হবে। সেজন্য নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত–সব কিছু পালন করাই হিজড়াদের জন্য ফরজ।

ইসলামি শরিয়া অনুযায়ী একজন হিজড়া নারীদের নামাজে প্রয়োজনে ইমামতিও করতে পারবে। নামাজে পর্দা করতে হবে, নামাজে বসার ক্ষেত্রে নারীদের মতো বসবে। হজ করতে পারবেন হিজড়া মোমিন, তবে এক্ষেত্রে একজন মাহরাম পুরুষ বেছে নিতে হবে এবং নারীদের মতোই হজের সব নিয়মকানুন তিনি পালন করবেন।

নাবালগ অবস্থায় হিজড়ার খতনা জরুরি। তবে বয়স হয়ে গেলে পরে খতনা করাতে চাইলে এমন নারী তাকে খতনা করাবে, যার সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তা না হলে, তাকে খতনাবিহীন জীবন অতিবাহিত করতে হবে।

হিজড়া নারী-পুরুষ পরস্পর বিয়ে করতে পারবে। তবে শর্ত থাকবে, সহবাসে তাদের সক্ষম হতে হবে। কোনো প্রকৃত হিজড়ার স্তনে যদি দুধ আসে, তা কাউকে পান করানো দ্বারা বৈবাহিক নিষিদ্ধতা সাব্যস্ত হবে না।

মৃত্যুর পর হিজড়াকে গোসল না দিয়ে তায়াম্মুম করানোই বিধান। এবং মৃত নারীদের মতো পাঁচ কাপড়ে কাফন পরাতে হবে। মুসলিম হিসেবে তার নামাজে জানাজা হবে। কবরে নামানোর সময় লাশ ওপর থেকে চাদর দ্বারা পর্দাবেষ্টিত থাকবে। [সূত্র: মাওলানা ইসমাঈল মাহমূদ: 'প্রসঙ্গ হিজড়া : ইসলামী দৃষ্টিকোণ', *বাতায়ন*, পূর্বোক্ত]।

আমাদের সমাজে হিজড়াদের সম্পর্কে অনেক কিছুই জানা নেই। হিজড়ারা নিজেদের অবস্থান ও পরিচয় সম্পর্কে সচেতন নয়। তারা মানুষ এবং মর্যাদাশীল মানুষ। তাদের মধ্যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মেহনত করা প্রয়োজন। তাবলিগ জামায়াতের সাথিরা বোবা, কালাদের মাঝেও ইমানের মেহনত করেন। হিজড়াদের মধ্যে দাওয়াতের কাজ আছে কি-না জানা নেই। থাকলে ভালো, না থাকলে শুরু করা দরকার। তাদেরও চিল্লায় পাঠানো দরকার। পরহেজগারি তাদের জন্যও জরুরি। মসজিদের খতিবরাও খুতবা পূর্ববর্তী বয়ানে হিজড়াদের প্রসঙ্গ আনলে ভালো হয়, যাতে সাধারণ মানুষ ও হিজড়াদের মধ্যকার দূরত্ব ঘুচে যায়।

লেখক: গ্রন্থকার ও গবেষক

বিশ্ব অ্যান্টিবায়োটিক সচেতনতা সপ্তাহ ২০১৮

মোহাম্মদ হাসান জাফরী

'অযথা অ্যান্টিবায়োটিক সেবন ক্ষতির কারণ, বিনা প্রেসক্রিপশনে তা কিনতে বারণ'– আমাদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ১২-১৮ই নভেম্বর বিশ্ব অ্যান্টিবায়োটিক সচেতনতা সপ্তাহ, ২০১৮ উপলক্ষে এ স্লোগান জনসচেতনতায় প্রচার করে চলেছে। অসুস্থ হলেই অ্যান্টিবায়োটিক! চিকিৎসক গতবার জ্বরে যে ওষুধ দিয়েছিলেন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই সে ওষুধ– এমন ইচ্ছেমাফিক অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া আর নিজেকে চিকিৎসক ভেবে জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করা থেকে বিরত থাকা জরুরি। ডাক্তার সাহেবকে মাঝে মাঝে কিছু রোগে বিশেষ অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে দেখে আমরা নিজেরাই ডাক্তারি বিদ্যা না জানা সত্ত্বেও পণ্ডিত বনে যাই। রোগীর অবস্থা, রোগের সংক্রমণ, অ্যান্টিবায়োটিক আদৌ প্রয়োজন আছে কি-না তা না বুঝেই আমরা নিজেরা আবার কখনোবা ওষুধের দোকানদারের পরামর্শে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া শুরু করি। অযথা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ভয়াবহতা জানা না থাকায় হরহামেশাই আমরা তা ব্যবহার করে চলেছি প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে। ফলে শরীরে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স তৈরি হচ্ছে।

কোনো অ্যান্টিবায়োটিক সাধারণভাবে যেসব জীবাণুর ওপর কাজ করার কথা, জীবাণুকে মেরে ফেলার কথা, তা যদি না করতে পারে তাহলে ঐ রোগীর দেহের ব্যাকটেরিয়াগুলোর ওপর ঐ অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যক্ষমতা কমে যায় এবং এক সময় পুরোপুরি লোপ পায়। পরে সেই রোগীর দেহ থেকে অন্য মানুষের শরীরে যে জীবাণু ছড়ায় তার ওপর ঐ অ্যান্টিবায়োটিক আর কাজ করে না। এটাই সহজ ভাষায় অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, অপ্রয়োজনে যে হারে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার হচ্ছে তাতে ২০৫০ সাল নাগাদ সাধারণ ইনফেকশনেও ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতা থাকবে না। বিশ্বে রোগীর চিকিৎসায় এক ক্রান্তিকালের সূচনা হবে, রোগী মারা যাবে, কারণ আমাদের কাছে তখন কোনো কার্যকর ওষুধ থাকবে না। তাই আমরা সকলে সচেতন হয়ে সঠিক রোগে, সঠিক সময়ে, নির্দিষ্ট মাত্রায়, নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার নিশ্চিত করব– এ শপথ আজই নিতে হবে।

উন্নত বিশ্বে রোগীর অপারেশনের পরও কখনো কখনো অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না কারণ অপারেশনের জন্য নির্ধারিত মেডিক্যাল টিমের সকল সদস্য রোগ সংক্রমণ রোধে পর্যাপ্ত আচরণবিধি মেনে চলেন। অথচ আমাদের দেশের বেশিরভাগ হাসপাতালে অপারেশনে উপযুক্ত রোগজীবাণুবিহীন পরিবেশ না থাকায় এবং মেডিক্যাল টিমের সকলের সচেতনতার বিষয়টি প্রশ্নবোধক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক অপারেশনের পর পরই অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করে দেন। অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার যখন তখন শুরু করলে এবং কোর্স সমাপ্ত না করলে ঐ রোগীর ক্ষেত্রে ঐ অ্যান্টিবায়োটিকের কার্যকারিতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। পরে ঐ ব্যক্তির শরীরে ঐ অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহারে আশানুরূপ সফলতা পাওয়া যায় না। ফলে ঐ রোগীর জন্য ঐ বিশেষ অ্যান্টিবায়োটিক অকার্যকর হয়ে পড়ে। এভাবে অন্য যে সমস্ত অ্যান্টিবায়োটিক কোনো রোগীর ক্ষেত্রে অপব্যবহার করা হলে সেগুলো আস্তে আস্তে ঐ রোগীর জন্য অকার্যকর হয়ে পড়বে বিধায় সকলকে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে। শুধু নিয়মমাফিক সঠিক প্রয়োজনে, সঠিক সময়ে, উপযুক্ত কালচার-সেনসিটিভিটি টেস্টের পর, সঠিক মাত্রায়, পর্যাপ্ত সময় পর্যন্ত অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে, তবেই ব্যাকটেরিয়া যথাযথ দমনে অ্যান্টিবায়োটিক কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

সাধারণত ডায়রিয়া হলে পানিশূন্যতা সৃষ্টি হয় আর এই পানিশূন্যতা রোধে ওরাল স্যালাইনই যথেষ্ট। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে অতি সাবধানতার জন্য অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজনীয়তা না থাকা সত্ত্বেও অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার রোগীর ব্যাকটেরিয়াকে শক্তিশালী হয়ে টিকে থাকতে ও বিস্তার লাভে সহায়তা করছে। এতে রোগীর রোগ সারতে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হচ্ছে। আমাদের দেশে অ্যান্টিবায়োটিকের সহজলভ্যতাই এজন্য দায়ী। অ্যান্টিবায়োটিক কিনতে এখন রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশনের প্রয়োজন হয় না। ওষুধের দোকানে কোনো রকমে নাম বলতে পারলেই বা কোনো কোনো ক্ষেত্রে দোকানদার রোগীর বর্ণনা মতে, নিজের অভিজ্ঞতায় অ্যান্টিবায়োটিক সরবরাহ করে থাকে। আবার অনেক ক্ষেত্রে দোকানদারের কোনো অভিজ্ঞতা না থাকায়, সুবিধা-অসুবিধা চিন্তা না করেই নিজের কৃতিত্ব জাহির করতে উচ্চমাত্রার অ্যান্টিবায়োটিক ক্রেতাকে সরবরাহ করেন যা রোগীর জন্য অধিক ক্ষতির কারণ। অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানসম্মত ওষুধের পাশাপাশি ওষুধের নির্দিষ্ট মাত্রার বিষয়টিও অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কোনো ব্যাকটেরিয়া নিধনে যদি ৫০০ মিলিগ্রাম নির্দিষ্ট ডোজ হয় আর ওষুধে ৫০০ মিলিগ্রাম লেখা থাকা সত্ত্বেও যদি ওষুধটি ৪০০ মিলিগ্রাম হয়ে থাকে তাহলে সেটি ব্যবহারেও অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স তৈরি হয়ে যেতে পারে যা রোগীর জন্য বিশেষ ক্ষতিকর। এই যে কম অ্যান্টিবায়োটিক রোগী খাচ্ছেন এটি চিকিৎসক ও রোগী উভয়েরই অজানা, তাই ওষুধ কোম্পানিগুলোর মানসম্মত ওষুধ তৈরি ও বাজারজাতকরণের নিশ্চয়তা দিতে হবে, যেটি দেখার দায়িত্ব ঔষধ প্রশাসনের। কৃষি ক্ষেত্রে মৎস্য, হাঁস-মুরগি ও গবাদিপশু পালনে খাবারে স্বল্পমাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা হয়। এর মধ্যে টেট্রাসাইক্লিন, পেনিসিলিন, সিপ্রোফ্লক্সাসিন, স্ট্রেপটোমাইসিন ইত্যাদি মানুষের জন্য অতি প্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক। উন্নত বিশ্বে এখন এগুলো ব্যবহারে দ্বিমত পোষণ করা হচ্ছে।

আসুন, সাধারণ মানুষ, ওষুধের দোকানদার, স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসক থেকে শুরু করে আমরা সকলে সঠিক প্রয়োজন ব্যতিরেকে যথেচ্ছভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার বন্ধ করি। এতে আপনি-আমি সকলে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের আওতার বাইরে থেকে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুযোগ পাব। পাশাপাশি পরিবেশ থেকে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্স যাতে তৈরি না হয় সেজন্য মাছ, হাঁস-মুরগি, গবাদিপশুর খাবারে ও কৃষি ক্ষেত্রে চাষবাসে স্বল্পমাত্রায় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার বর্জন করি। সুন্দর আগামীর জন্য, আমাদের বসবাস উপযোগী একমাত্র পৃথিবীকে রোগমুক্ত রাখতে, রোগাক্রান্তদের সহজলভ্য চিকিৎসার সুবিধার্থে, উন্নত বিশ্ব গড়তে সকলে মিলে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে আরো সতর্ক হওয়ার এখনই সময়।

লেখক: কলামিস্ট

গদ্যের জাদুকর হুমায়ূন

বিনয় দত্ত

সাহিত্যের বরপুত্র, সাহিত্যরাজ, গদ্যের জাদুকর, সাহিত্য সম্রাটসহ অসংখ্য নাম তাঁর। এই নামগুলো তাঁর নিজের দেওয়া নয়। ভক্তরা ভালোবেসে তাঁকে এই নামে সম্বোধন করেন। শুধু ভালোবাসলে বললে ভুল বলা হবে। তার সৃষ্ট চরিত্র হয়ে ভক্তরা কখনো ঘুরে বেড়ান, আলাদা করে শান্তিপূর্ণ মিছিল বা র‍্যালি করেন। বিশেষ দিনে, বিশেষ ক্ষণে তাঁকে স্মরণ করার জন্য সামাজিক মাধ্যম থেকে শুরু করে আলাদাভাবে সক্রিয় গ্রুপ বা দল তৈরি করে নিজেদের অবস্থান জানিয়ে দেন। এতকিছু যদি একজন লেখক জীবদ্দশায় দেখে যান তবে কি তাঁর আর কিছুর প্রয়োজন আছে? বলছিলাম বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় লেখক হুমায়ূন আহমেদের কথা।

যিনি একাধারে একজন কথাসাহিত্যিক, ছোটো গল্পকার, নাট্যকার, গীতিকার, শিশুসাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি রচয়িতা, নাট্যনির্মাতা ও চলচ্চিত্র পরিচালক। সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় হলো, তিনি এই সকল শাখায় সফল একজন ব্যক্তি। উপন্যাসে তাঁর জনপ্রিয়তা নতুন করে বলার কিছু নেই, তাঁর ছোটোগল্প অনবদ্য। নাট্যকার হিসেবেও হুমায়ূন আহমেদ সফল, গীতিকার হিসেবে তাঁর লেখা গান সর্বজনপ্রিয়। হুমায়ূন আহমেদের শিশুসাহিত্য শিশু-কিশোরদের মধ্যে দারুণ আলোড়ন তোলে। বাংলাদেশের সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির জনক হুমায়ূন আহমেদ। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত 'তোমাদের জন্য ভালোবাসা' বাংলাদেশের প্রথম বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি।

মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন ব্যবস্থাকে সুন্দর গদ্যশৈলীর মধ্যে এনে পাঠকের মন জয় করে নিয়েছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। তাঁর *নন্দিত নরকে* উপন্যাসের মধ্য দিয়েই তিনি প্রমাণ করেছেন, বাংলা সাহিত্যে তিনি স্থায়ীভাবে থাকার জন্য এসেছেন। অতিথি পাখির মতো উবে যাওয়ার জন্য নয়। তাঁর জাদুকরী লেখনী দিয়ে তিনি প্রচুর পাঠক তৈরি করেছেন।

শক্তিমান কথাসাহিত্যিক সোমেন চন্দের পর হুমায়ূন নিজে এইভাবে মধ্যবিত্ত জীবনসমাজকে নিজের লেখনীতে তুলে ধরেছেন। মধ্যবিত্ত জীবনের সংকট, ভালোলাগা, ভালোবাসা, অভাব, পীড়ন এত চমৎকার গদ্য ভঙ্গিমায় হুমায়ূন উপস্থাপন করেছেন যে পাঠককে উপন্যাস শেষ করতে বাধ্য করবে।

যে সময়টাতে কলকাতার বইতে সারাদেশ সয়লাব হয়ে গিয়েছিল, সেই সময় সাহিত্য বলতেই পাঠক বুঝতই শুধু কলকাতার শক্তিমান লেখকদের বই বা সাহিত্যের কথা, সেই সংকট সময়ে হুমায়ূন আহমেদ নিজের জাদুকরী লেখনীর বলে ধীরে ধীরে পাঠক তৈরি করেছেন। এই জাদুকরী লেখনী শুধু উপন্যাসে ছিল তা নয়, ছোটোগল্পেও ছিল। তাঁর ছোটোগল্প পাঠকের মনে এমন জায়গা করে নিয়েছে যে, গল্প পাঠ করার পর এক ধরনের অতৃপ্ত অনুভূতি নিয়ে ঘুরতে হয়। সেই অনুভূতি ব্যক্ত করার মতো নয়, সেই অনুভূতি বিরামহীন।

তাঁর সৃষ্ট *নন্দিত নরকে*, *শঙ্খনীল কারাগার*, *শ্রাবণ মেঘের দিন*, *কোথাও কেউ নেই*, *জোছনা ও জননীর গল্প*, *ময়ূরাক্ষী*, *কবি*, *গৌরীপুর জংশন*, *বহুব্রীহি*, *মেঘ বলেছে যাব যাব*, *মধ্যাহ্ন*, *অচিনপুর*, *শ্যামল ছায়া*, *অনিল বাগচীর একদিন*, *১৯৭১*, *এইসব দিনরাত্রি*, *মাতাল হাওয়া*, *বাদশাহ নামদার* অনবদ্য।

বিশেষ করে *নন্দিত নরকে*, *শঙ্খনীল কারাগার*, *কোথাও কেউ নেই*, *জোছনা ও জননীর গল্প*, *মধ্যাহ্ন*, *বাদশাহ নামদার*– এইসব গ্রন্থ পাঠক চোখ বন্ধ করে নিজের পছন্দের তালিকায় রাখবেন। এইসব উপন্যাস পাঠককে এমনভাবে আবেগতাড়িত করেছে, চরিত্রগুলোকে বিস্তৃত করার মাধ্যমে লেখক এত গভীরভাবে পাঠকের সাথে মনঃসংযোগ ঘটিয়েছেন যা বলার মতো নয়।

হুমায়ূন আহমেদের সহজ গদ্যভঙ্গিমা পড়ে কতজন যে লেখক হওয়ার চেষ্টা করেছেন তার ইয়াত্তা নেই। সহজ করে ছোটো ছোটো বাক্যে গল্প বলার ক্ষমতা হুমায়ূন আহমেদের ছিল। এইভাবে অনেকে চেষ্টা করেছেন হয়ত, সফল হয়েছেন, হয়ত হয়নি। কবিগুরুর মতো বলতে হয়–

সহজ কথায় লিখতে আমায় কহ যে,
সহজ কথা যায় না লেখা সহজে।
লেখার কথা মাথায় যদি জোটে
তখন আমি লিখতে পারি হয়তো।
কঠিন লেখা নয়কো কঠিন মোটে,
যা-তা লেখা তেমন সহজ নয় তো।

একজন লেখকের গোটা জীবনে একসাথে অনেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম

থাকে না। দুই-একটা সাহিত্যকর্ম একজন লেখকের জীবনকে স্মরণীয় করে তোলে। সেদিক থেকে হুমায়ূন আহমেদ ভিন্ন। *নন্দিত নরকে*, *শঙ্খনীল কারাগার*, *কোথাও কেউ নেই*, *জোছনা ও জননীর গল্প*, *মধ্যাহ্ন*– এই সাহিত্যকর্মগুলো দিয়ে হুমায়ূন আহমেদকে আলাদাভাবে বিশ্লেষণ করা যায়।

তিনি আসলে লেখক নন। তিনি একজন জাদুকর। গদ্যের জাদুকর। যে জাদুকর তাঁর ক্ষমতা বলে সবাইকে মুগ্ধ, মাতোয়ারা করে রাখতেন। হুমায়ূন আহমেদ তাঁর লেখনীর জাদুতে পাঠকদের মোহাবিষ্ট করে রাখতেন। তাঁর উপন্যাস নিয়ে বসেছে, শেষ করে ওঠেনি এমন পাঠক কমই পাওয়া যাবে।

লেখনীতে তিনি অনেক ধরনের তথ্য-উপাত্ত দিতেন কিন্তু কখনোই তা বিরক্তির পর্যায়ে নিয়ে যেতেন না। বরং সেই তথ্যটা না জানলে নিজের মধ্যে এক ধরনের শূন্যতা অনুভব হতো। তাঁর তথ্যবহুল উপন্যাসের মধ্যে *জোছনা ও জননীর গল্প*, *মাতাল হাওয়া*, *মধ্যাহ্ন*, *বাদশাহ নামদার* অনন্য।

শুধু উপন্যাসই নয়, তাঁর উপন্যাসের শক্তিমান চরিত্রগুলো সাধারণ পাঠকের মনে এমনভাবে দাগ কেটেছে যে, পাঠক নিজেদের সেই চরিত্র মনে করত। রুপা, হিমু, মিসির আলী, শুভ্র, বাকের ভাই– এই চরিত্রগুলো পাঠক এখনো মনে নিয়ে বেড়ায়। এইসব চরিত্রের প্রভাব এত প্রখর ছিল যে, কখনো পাঠক চরিত্রের মাঝে কখনোবা চরিত্রকে সাথে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে।

ভয়, *জিন-কফিল*, *অচিন বৃক্ষ*, *নিজাম সাহেবের ভূত*, *খেলা*, *পিঁপড়া*, *জীবনযাপন*, *খবিস*, *মৃত্যুগন্ধ*, *নিমধ্যমা*, *যন্ত্রসহ* অসংখ্য ছোটোগল্পের মধ্য দিয়ে তিনি পাঠকের মধ্যে এমন তাড়না অনুভব করিয়েছেন যে, পাঠক তাঁর ছোটোগল্পকেও অস্বীকার করতে পারেননি।

তিনশর অধিক গ্রন্থের রচয়িতা হুমায়ূন আহমেদ সচেতনভাবে শিশুদের জন্য আলাদা সাহিত্য রচনা করেছেন। *পুতুল*, *বোতল ভূত*, *নুহাশ এবং আলাদিনের আশ্চর্য চেরাগ*, *তোমাদের জন্য রূপকথা*, *কাক ও কাঠ গোলাম*, *হলুদ পরী*, *বনের রাজা*, *ভূতমন্ত্র*, *রাক্ষস খোক্কস এবং ভোক্ষস*সহ বেশ কিছু শিশুসাহিত্য রচনা করেছেন যা শিশু-কিশোররা আনন্দের সাথে পাঠ করেছে।

শুধু শিশুসাহিত্যই নয়, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি লিখে রীতিমতো বিস্মিত করে দিয়েছেন তাঁর পাঠকদের। *তোমাদের জন্য ভালোবাসা*, *নি*, *ফিহা সমীকরণ*, *ইমা*, *ওমেগা পয়েন্ট*, *ইরিনা*, *দ্বিতীয় মানবসহ* তাঁর যেসব বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি রয়েছে তা পাঠকপ্রিয়।

ব্যক্তি হিসেবে হুমায়ূন আহমেদ যথেষ্ট আমুদে প্রকৃতির ছিলেন। দলবল নিয়ে ঘুরতে পছন্দ করতেন। খাওয়াদাওয়া পছন্দ করতেন। মানুষকে অবাক করে দেওয়ার ক্ষমতা তাঁর ছিল বিশেষ। বৃষ্টি এবং জ্যোৎস্না তাঁর সবচেয়ে বেশি পছন্দের ছিল। তিনি তাঁর সাহিত্যে এই দুইটা বিষয় এমনভাবে তুলে ধরেছেন যে, পাঠকরা প্রতিবার এই দুই অদ্ভুত সৌন্দর্যের প্রেমে পড়ে যেতেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরে বাংলা ভাষায় সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক হলেন হুমায়ূন আহমেদ। এই জনপ্রিয়তা তাঁর গদ্যের জাদুকরী ক্ষমতার কারণে। এই জনপ্রিয়তাকে তিনি অস্বীকার করতেন না কখনো। গদ্যের জাদুকর হুমায়ূন আহমেদ শারীরিকভাবে আজ আমাদের মাঝে নেই। তাঁর সাহিত্যকর্মের কারণে তিনি আরো বহু যুগ পাঠকের অন্তরালে ভালোবাসা নিয়ে বিচরণ করবেন এই ধরণীতে। তাঁর সরল গদ্যের জাদুকরী ক্ষমতায় পাঠক এখনো তাঁকে খুঁজে ফেরেন। কে জানে, অশরীরী হুমায়ূন আহমেদ হয়ত তাঁকে খোঁজার ব্যাপারটাও বেশ উপভোগ করছেন।

লেখক: সাহিত্যিক ও সাংবাদিক

নিবন্ধ

নতুন ভাবনা: ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন

খান চমন-ই-এলাহি

তর্ক-বিতর্ক, আলোচনা-সমালোচনা আর পক্ষে-বিপক্ষে মতামতের পাহাড় জমেছে; কোনো পক্ষকে সরাসরি নাকচ করার সুযোগ নেই। সকলেরই অজুহাত, যুক্তি-মানবাধিকার, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য মানুষের অধিকার সংকুচিত না করে বিকশিত করার সুযোগ দেওয়া। আর সেটি কেবল সম্ভব অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা। আইনের চোখে সবাই সমান। কেউ কারো চেয়ে ছোটো বা বড়ো নয়। আইনের নির্ধারিত পথে, দেখানো পথে চলতে হবে। কে রাজা, বাদশাহ, সৈন্য-চাকুরে বা ইমাম-পুরোহিত তা বিশ্লেষণ করার সুযোগ আইনে নেই; আইন খুঁজবে দোষী ও নির্দোষী, অপরাধী ও নিরাপরাধী। সে কারণে বৃত্তের ভেতরে-বাইরে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮ নিয়ে বহু মত-পথের জন্ম হচ্ছে। যদিও সরকার আইনটি প্রণয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছে এবং বলছে।

আলোচ্য বিষয়টি পুরোপুরি পাঠকের নজরে আনতে পারলে ভালো হতো। সেটাই সমীচীন ছিল। কিন্তু কলেবরের অভাবে চুম্বকাংশ উপস্থাপনের প্রয়াস নেওয়া হচ্ছে। আইনটি ২০১৮ সালের ৪৬ নং আইন। এ আইনটি ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং ডিজিটাল মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন, বিচার ও আনুষ্ঠানিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত। এ আইনে একটি অভিভাবকত্বের স্থান রয়েছে। আর সেটি হলো ১২ ধারা অনুযায়ী 'জাতীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা কাউন্সিল'। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীকে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান করে ১৩ (তেরো) সদস্যবিশিষ্ট এ কাউন্সিল গঠিত হবে। যুগপৎ, ৫ ধারা অনুযায়ী ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি গঠিত হবে। মহাপরিচালক হবেন এজেন্সি প্রধান। সঙ্গী হবেন দুজন পরিচালক। এ এজেন্সির প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণের ক্ষমতা থাকবে। ৯ ধারা অনুযায়ী, এজেন্সির অধীনে থাকবে জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম। আরো থাকবে ১০ ধারা অনুযায়ী এক বা একাধিক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব।

এ আইনের ধারা ২-এর উপধারা (১)-এর (ক-ফ) পর্যন্ত এবং উপধারা (২)-এ সংজ্ঞা-অর্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আমরা ৭/৮টি সংজ্ঞা উল্লেখ করছি। এখানে উপধারা (১)-এ বলা হয়েছে, বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে এই আইনে- (ছ) গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো অর্থ সরকার কর্তৃক ঘোষিত এইরূপ কোনো বাহ্যিক বা ভার্চুয়াল তথ্য পরিকাঠামো যাহা কোনো তথ্য-উপাত্ত বা কোনো ইলেকট্রনিক তথ্য নিয়ন্ত্রণ, প্রক্রিয়াকরণ, সঞ্চারণ বা সংরক্ষণ করে এবং যাহা ক্ষতিগ্রস্ত বা সংকটাপন্ন হইলে-(অ) জননিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বা জনস্বাস্থ্য, (আ) জাতীয় নিরাপত্তা বা রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা বা সার্বভৌমত্বের উপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়িতে পারে; (ঝ) ডিজিটাল, (ঞ) ডিজিটাল ডিভাইস, (ট) ডিজিটাল নিরাপত্তা, (ধ) মানহানি, (ন) ম্যালওয়ার, (প) মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মতো বিষয়ের সংজ্ঞা এবং উপধারা (২)-এ বলা হয়েছে, এই আইনে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা এই আইনে প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬-এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে- এমনটি উল্লেখ করেছে।

এ আইনের ৪ ধারার মূল বিষয় হলো, বাংলাদেশের বাইরে বা অভ্যন্তর থেকে কেউ এ আইনের অধীনে কোনো অপরাধ সংঘটন করলে অপরাধটি বাংলাদেশেই সংঘটিত হয়েছে। এক্ষেত্রে লোকটি দণ্ডের অধীন।

এ আইনের ষষ্ঠ অধ্যায়ে অপরাধ ও দণ্ড নিয়ে (১৭ থেকে ৩৮ ধারায়) আলোচনা করা হয়েছে। ধারা ১৭ (১) অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোতে–(ক) বে-আইনি প্রবেশ করেন, বা (খ) বে-আইনি প্রবেশের মাধ্যমে উহার ক্ষতিসাধন বা বিনষ্ট বা অকার্যকর করেন অথবা করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ। ১৭ (২) ধারা অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি উপধারা (১)-এর (ক) দফা (ক) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন; এবং (খ) দফা (খ)-এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। ১৭ (৩) ধারা অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি উপধারা (১)-এ উল্লেখিত অপরাধ দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা ১৮ (১) আনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে– (ক) কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে বে-আইনি প্রবেশ করেন বা করিতে সহায়তা করেন, বা (খ) অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে বে-আইনি প্রবেশ করেন বা প্রবেশ করিতে সহায়তা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ। ১৮ (২) ধারা অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি উপধারা (১)-এর (ক) দফা (ক)-এর অধীন কোনো অপরাধ

সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে, বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন; এবং (খ) দফা (খ)-এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। ১৮ (৩) ধারা অনুযায়ী, যদি উপধারা (১)-এর অধীন কৃত অপরাধ কোনো সংরক্ষিত কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। ১৮ (৪) ধারা অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি এই ধারার অধীন কোনো অপরাধ দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন তাহা হইলে মূল অপরাধের জন্য যে দণ্ড নির্ধারিত রহিয়াছে তিনি উহার দ্বিগুণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা ১৯ (১) অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি–(ক) কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হইতে কোনো উপাত্ত, উপাত্ত ভাণ্ডার, তথ্য বা উহার উদ্ধৃতাংশ সংগ্রহ করেন, বা স্থানান্তরযোগ্য জমাকৃত তথ্য-উপাত্তসহ উক্ত কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের তথ্য সংগ্রহ করেন বা কোনো উপাত্তের অনুলিপি বা অংশ বিশেষ সংগ্রহ করেন, বা (খ) কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোনো ধরনের সংক্রামক ম্যালওয়ার বা ক্ষতিকর সফটওয়্যার প্রবেশ করান বা প্রবেশ করানোর চেষ্টা করেন, বা (গ) ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, উপাত্ত বা কম্পিউটারের উপাত্ত ভাণ্ডারের ক্ষতিসাধন করেন, বা ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করেন, বা উক্ত কম্পিউটার, সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে রক্ষিত অন্য কোনো প্রোগ্রামের ক্ষতি সাধন করেন বা করিবার চেষ্টা করেন, বা (ঘ) কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে কোনো বৈধ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোনো উপায়ে প্রবেশ করিতে বাধা সৃষ্টি করেন বা বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করেন, বা (ঙ) ইচ্ছাকৃতভাবে প্রেরক বা গ্রাহকের অনুমতি ব্যতীত, কোনো পণ্য বা সেবা বিপণনের উদ্দেশ্যে, স্পাম উৎপাদন বা বাজারজাত করেন বা করিবার চেষ্টা করেন বা অযাচিত ইলেকট্রনিক মেইল প্রেরণ করেন, বা (চ) কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ বা কারসাজি করিয়া কোনো ব্যক্তির সেবা গ্রহণ বা ধার্যকৃত চার্জ অন্যের হিসাবে জমা করেন বা করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ। ধারা ১৯ (২) যদি কোনো ব্যক্তি উপধারা (১)-এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। ধারা ১৯ (৩) অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি উপধারা (১) এ উল্লেখিত অপরাধ দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা ২০ (১)-এ কম্পিউটারের সোর্স কোড পরিবর্তন বা ধ্বংস সংক্রান্ত অপরাধ সম্পর্কে বলা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি এ অপরাধ করিলে ২০ (২) অনুযায়ী অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের কারাদণ্ডে বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। আর যদি দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি ২০ (৩) উপধারা অনুযায়ী, অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা ২১ (১) অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি ডিজিটাল মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, জাতির পিতা, জাতীয় সংগীত বা জাতীয় পতাকার বিরুদ্ধে কোনো প্রকার প্রপাগান্ডা ও প্রচারণা চালান বা উহাতে মদদ প্রদান করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ। কোনো ব্যক্তি উপধারা (১) এর এ অপরাধটি করিলে তিনি উপধারা (২) অনুযায়ী অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। এ উল্লেখিত অপরাধ তিনি যদি দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি উপধারা (৩) অনুযায়ী, যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৩ (তিন) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা ২২-এর উপধারা (১) অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে জালিয়াতি করেন, তাহা হইলে এটি হবে অপরাধ। এবং এর দণ্ড হবে উপধারা (২) অনুযায়ী, অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। এ উল্লেখিত অপরাধ তিনি যদি দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি উপধারা (৩) অনুযায়ী অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা ২৩-এর উপধারা (১) অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে প্রতারণা করেন তাহা হইলে তার উপধারা (২) অনুযায়ী, অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। এ উল্লেখিত অপরাধ তিনি যদি দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি উপধারা (৩) অনুযায়ী অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা ২৪-এর উপধারা (১) অনুযায়ী, পরিচয় প্রতারণা বা ছদ্মবেশ ধারণ একটি অপরাধ। উপধারা (২) অনুযায়ী, অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত তাহা হইলে। এ উল্লেখিত অপরাধ তিনি যদি দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি উপধারা (৩) অনুযায়ী অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা ২৫-এর উপধারা (১) অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ডিজিটাল মাধ্যমে–(ক) ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে, এমন কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ করেন, যাহা আক্রমণাত্মক বা ভীতি প্রদর্শক অথবা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, কোনো ব্যক্তিকে বিরক্ত, অপমান, অপদস্থ বা হেয় প্রতিপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে বা কোনো তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ বা প্রচার করেন, বা (খ) রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি বা সুনাম ক্ষুণ্ন করিবার, বা বিভ্রান্তি ছড়াইবার, বা তদুদ্দেশ্যে, অপপ্রচার বা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও, কোনো তথ্য সম্পূর্ণ বা আংশিক বিকৃত আকারে প্রকাশ, বা প্রচার করেন বা করিতে সহায়তা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ। এ অপরাধের দণ্ড হবে উপধারা (২) অনুযায়ী, অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। এ উল্লেখিত অপরাধ তিনি যদি দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি উপধারা (৩) অনুযায়ী অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয়

দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা ২৬-এর উপধারা (১)-এ অনুমতি ব্যতীত পরিচিতি তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে বলা হয়েছে। এ অপরাধের দণ্ড হবে উপধারা (২) অনুযায়ী, অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। এ উল্লেখিত অপরাধ তিনি যদি দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি উপধারা (৩) অনুযায়ী অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। এ ধারার ব্যাখ্যায় 'পরিচিতি তথ্য' অর্থ কোনো বাহ্যিক, জৈবিক বা শারীরিক তথ্য বা অন্য কোনো তথ্য যাহা এককভাবে বা যৌথভাবে একজন ব্যক্তি বা সিস্টেমকে শনাক্ত করে, যাহার নাম, ছবি, ঠিকানা, জন্ম তারিখ, মাতার নাম, পিতার নাম, স্বাক্ষর, জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধন নম্বর, ফিংগার প্রিন্ট, পাসপোর্ট নম্বর, ব্যাংক হিসাব নম্বর, ড্রাইভিং লাইসেন্স, ই-টিআইএন নম্বর, ইলেকট্রনিক বা ডিজিটাল স্বাক্ষর, ব্যবহারকারীর নাম, ক্রেডিট বা ডেবিট কার্ড

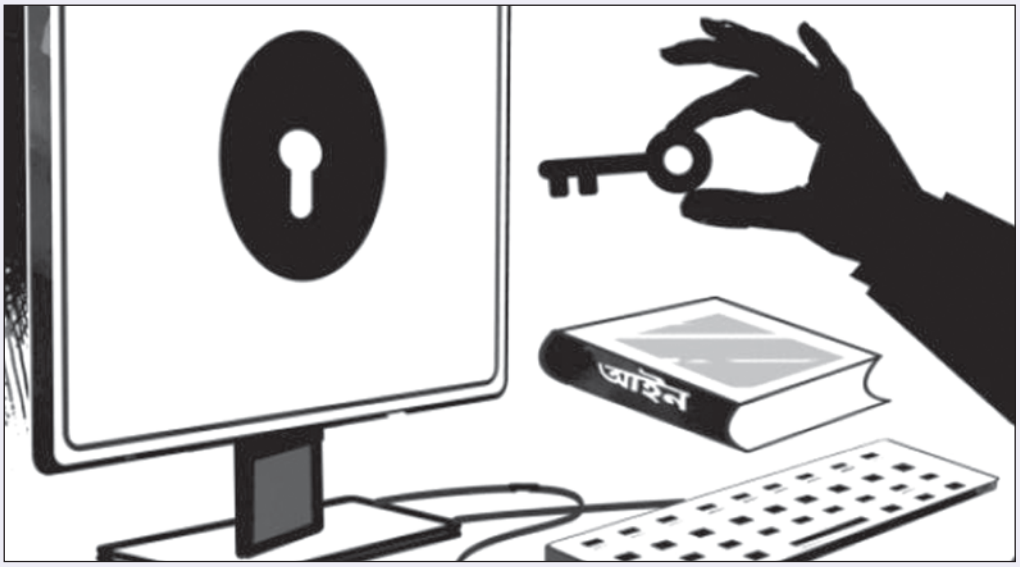

নম্বর, ভয়েজ প্রিন্ট, রেটিনা ইমেজ, আইরেস ইমেজ, ডিএনএ প্রোফাইল, নিরাপত্তামূলক প্রশ্ন বা অন্য কোনো পরিচিতি যাহা প্রযুক্তির উৎকর্ষতার জন্য সহজলভ্য।

ধারা ২৭-এর উপধারা (১)-এ সাইবার সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনের অপরাধ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অপরাধের দণ্ড হবে উপধারা (২) অনুযায়ী, অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। এ উল্লিখিত অপরাধ তিনি যদি দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি উপধারা (৩) অনুযায়ী যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা ২৮-এর উপধারা (১) অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে ধর্মীয় মূল্যবোধ বা অনুভূতিতে আঘাত করিবার বা উস্কানি প্রদানের অভিপ্রায়ে ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা প্রচার করেন বা করান, যাহা ধর্মীয় অনুভূতি বা ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর আঘাত করে, তাহা হইলে উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ। এ অপরাধের জন্য উপধারা (২) অনুযায়ী, অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। এ উল্লেখিত অপরাধ তিনি যদি দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি উপধারা (৩) অনুযায়ী অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা ২৯-এর উপধারা (১) অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক বিন্যাসে Penal Code (Act XLV of 1860) এর section 499 এ বর্ণিত মানহানিকর তথ্য প্রকাশ বা প্রচার করেন, তজ্জন্য তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। এ উল্লেখিত অপরাধ তিনি যদি দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি উপধারা (২) অনুযায়ী অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা ৩০-এর উপধারা (১)-এ আইনানুগ কর্তৃত্ব বহির্ভূত ই-ট্রানজেকশন সম্পর্কে বলেছে। এ অপরাধের দণ্ড হবে উপধারা (২) অনুযায়ী, অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। এ উল্লেখিত অপরাধ তিনি যদি দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি উপধারা (৩) অনুযায়ী অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা ৩১-এর উপধারা (১) অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইট বা ডিজিটাল বিন্যাসে এমন কিছু প্রচার বা সম্প্রচার করেন বা করান, যাহা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা, ঘৃণা বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে বা অস্থিরতা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে অথবা আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটায় বা ঘটিবার উপক্রম হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ। (২) উপধারা অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি উপধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। (৩) উপধারা অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি উপধারা (১) এ উল্লিখিত অপরাধ দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ১০ (দশ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা ৩২-এর উপধারা (১) অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি Official Secrets Act, 1923-এর আওতাভুক্ত কোনো অপরাধ কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ডিজিটাল নেটওয়ার্ক, বা অন্য কোনো ডিজিটাল মাধ্যমে সংঘটন করেন বা করিতে সহায়তা করেন, তাহা হইলে তিনি , অনধিক ১৪ (চৌদ্দ)

বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। (২) উপধারা অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি উপধারা (১) এ উল্লেখিত অপরাধ দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা ৩৩-এর উপধারা (১) অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি কম্পিউটার বা ডিজিটাল সিস্টেমে বেআইনি প্রবেশ করিয়া সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা কোনো আর্থিক বা বাণিজ্যিক সংস্থার কোনো তথ্য-উপাত্তের কোনোরূপ সংযোজন বা বিয়োজন, স্থানান্তর বা স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করেন বা করিতে সহায়তা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ। এ অপরাধে উপধারা (২) অনুযায়ী, অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। উপধারা (৩) অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি উপধারা (১) এ উল্লেখিত অপরাধ দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১৫ (পনের) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা ৩৪-এ হ্যাকিং সংক্রান্ত অপরাধের কথা বলা হয়েছে। কেউ প্রথমবার এ অপরাধ করলে ৩৪ (১) অনুযায়ী, অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন। ৩৪ (২) অনুযায়ী, যদি দ্বিতীয়বার বা পুনঃপুন সংঘটন করেন তাহা হইলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ধারা ৩৫-এ অপরাধ সংঘটনের সহায়তাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে। এবং মূল অপরাধটির জন্য যে দণ্ড নির্ধারিত রয়েছে, সহায়তাকারীকে অনুরূপ দণ্ড ভোগ করতে হবে।

ধারা ৩৬-এ কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটনের কথা বলা হয়েছে। উপধারা (১) কোনো কোম্পানি কর্তৃক এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে, উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে, কোম্পানির এইরূপ প্রত্যেক মালিক, প্রধান নির্বাহী, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব, অংশীদার বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা প্রতিনিধি উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে হইয়াছে বা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। (২) উপধারা (১)-এ উল্লেখিত কোম্পানি আইনগত ব্যক্তি সত্তা বিশিষ্ট সংস্থা হইলে, উক্ত ব্যক্তিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানিকে আলাদাভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাব্যস্ত করা যাইবে, তবে উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান মোতাবেক কেবল অর্থদণ্ড আরোপযোগ্য হইবে।

ধারা ৩৭-এ ক্ষতিপূরণের আদেশ দানের ক্ষমতা সম্পর্কে বলা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি ধারা ২২-এর অধীন ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক জালিয়াতি, ধারা ২৩-এর অধীন ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক প্রতারণা এবং ধারা ২৪-এর অধীন পরিচয় প্রতারণা বা ছদ্মবেশ ধারণের মাধমে অপর কোনো ব্যক্তির আর্থিক ক্ষতিসাধন করিলে, ট্রাইব্যুনাল, সৃষ্ট ক্ষতির সমতুল্য অর্থ বা তদ্‌বিবেচনায় উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রদানের জন্য আদেশ দিতে পারিবে।

ধারা ৩৮-এ সেবা প্রদানকারী দায়ী না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তবে সেবা প্রদানকারীকে প্রমাণ করতে হবে সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা লঙ্ঘন তার অজ্ঞাতসারে ঘটেছে বা যাতে অপরাধ সংঘটিত না হয় তজ্জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন।

এ আইনের সপ্তম অধ্যায়ের ৪২ ধারায় পরোয়ানার মাধ্যমে তল্লাশি ও জব্দ বিষয়ে বলা হয়েছে। তবে এ ধারায় ট্রাইবুন্যাল, বা ক্ষেত্রমতে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট থেকে পুলিশ অফিসারকে আবেদনের মাধ্যমে তল্লাশি পরোয়ানা সংগ্রহ করিতে হইবে। আর ৪৩ ধারায় পরোয়ানা ব্যতিরেকে তল্লাশি, জব্দ ও গ্রেফতারের বিষয়ে বলা হয়েছে।

ধারা ৫৩ অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিনযোগ্যতা– এই আইনের –

(ক) ধারা ১৭, ১৯, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৬, ২৭, ২৮, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪ এ উল্লেখিত অপরাধসমূহ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য হইবে; এবং

(খ) ধারা ১৮-এর উপধারা (১) এর দফা (খ), ২০, ২৫, ২৯, ও ৪৭-এর উপধারা (৩) এ উল্লেখিত অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য ও জামিনযোগ্য হইবে;

(গ) ধারা ১৮-এর উপধারা (১) এর দফা (ক)তে, উল্লেখিত অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য, জামিনযোগ্য ও আদালতের সম্মতি সাপেক্ষে আপোষযোগ্য হইবে;

(ঘ) অধীন কোনো অপরাধ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক দ্বিতীয় বা ততোধিকবার সংঘটনের ক্ষেত্রে উক্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য হইবে।

সম্পত্তির বাজেয়াপ্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে ৫৪ ধারায়। এ আইনের অধীনে কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে, যে কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ফ্লপি ডিস্ক, কমপ্যাক্ট ডিস্ক, টেপ-ড্রাইভ বা অন্য কোনো আনুষঙ্গিক কম্পিউটার উপকরণ বা বস্তু সম্পর্কে বা সহযোগে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে সেগুলো ট্রাইবুন্যালের আদেশানুসারে বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে। তবে ট্রাইবুন্যাল সন্তুষ্ট হইলে বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে না। আর অপরাধ সংঘটনের জন্য কোনো সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার কোনো কম্পিউটার বা তৎসংশ্লিষ্ট কোনো উপকরণ বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে তা বাজেয়াপ্ত হইবে না।

এ আইনের ৫৭ ধারায় সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে– এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনকালে সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো কার্যের ফলে কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তজ্জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো কর্মচারী বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোনো আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

সকল প্রকার বিভেদ ঘুচাবার জন্য, আইনের সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য, নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য নিরূপণের জন্য, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুসংহত করার জন্য আইন প্রণয়নের দরকার পড়ে। সে কারণে সরকার, রাষ্ট্র ও জনগণের স্বার্থে আইন প্রণয়ন করে। তবে আমাদের সকলকে মনে রাখতে হবে, কোনো আইনে যদি মানবাধিকার, দেশ রক্ষার নিশ্চয়তা পর্যাপ্ত না থাকে এবং ভীতি ও হয়রানির পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে জনমনে নেতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হবে। পৃথিবীর কোনো দেশের প্রতি নতজানু না হওয়ার মন্ত্রে উজ্জীবিত, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষের সকল মানুষ ও বাংলাদেশকে আগামী প্রজন্মের বাসযোগ্য মাতৃভূমি করার স্বার্থে উপলব্ধি আবশ্যক। নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, চিরন্তন বাংলাদেশ সেই উপলব্ধি জানে।

লেখক: অ্যাডভোকেট, সাংবাদিক, কলামিস্ট ও কবি

স্বরবর্ণ-ধ্বনির উচ্ছ্বাস

অসীম সাহা

তুমিহীন এই আমি আমাকেই শেষ করে দেবো।
বর্ণের সুষমাহীন অভিধান আমার জীবনে কোনো প্রয়োজন নেই।
প-বর্গীয় পঞ্চম বর্ণের মৃদু ভর্ৎসনা নিয়ে এই বেঁচে থাকা
কতটা মধুর আর স্নিগ্ধ হতে পারে–প্রতিদিন, প্রতিপলে তোমার ঐ
ব্যক্তিগত অভিধান পাঠ করে, উৎসশব্দের মূলে
ঢুকে গিয়ে টের পাই আমি।
ম-বর্ণশোভিত হে আমার মূর্ত অভিধান–
প্রার্থনায় তন্দ্রালীন ভক্তের অনুগত চুম্বনে যেইভাবে ধন্য হয়
ধর্মগ্রন্থের সব অলৌকিক পাতা–
তোমাকে তেমনি করে পেয়ে আমি প্রতিদিন, প্রতিপলে ধন্য হই।
তোমার ঐ শরীরের কেন্দ্রে কেন্দ্রে সতর্ক শিক্ষকের
তীক্ষ্ণ চোখের মতো প্রহরায় ব্যস্ত থাকি–
কখনো বা নকল ধরার পর হল থেকে বহিষ্কার করার মতো
ফেলে দিই অপ্রয়োজনীয় কিছু কিছু শব্দ-আবর্জনা।
কখনো বা প্রতিপলে চুম্বনে চুম্বনে সিক্ত করি
নিষ্কলঙ্ক তোমার দেহের প্রিয় প্রতি পঙ্‌ক্তিমালা।
শিহরণে কেঁপে ওঠে দীর্ঘ বছরব্যাপী পরিত্যক্ত
তোমার এই জীবনের তেত্রিশটি পাতা!
অবশেষে মাধবীলতার বনে দোল খায়
অসীম আকাশে ওড়া স্বরবর্ণের ডানার উচ্ছ্বাস!

যদি

মাকিদ হায়দার

যদি আর কটা দিন বেঁচে থাকি
তোমার নামে লিখে দেবো জাহাজটা,
আসবে যাবে যখন-তখন, তোমার
যখন ইচ্ছে হবে।
মুখটা যদি দেখতে না দাও, দেখতে দিও
আলতা মাখা চরন দুটি,
তাতেই আমার পূরণ হবে হাজার আশা।
অনেক দিনের
গুছিয়ে রাখা অনেক কথা
ফিরিয়ে দেবো তোমার হাতে।
স্মৃতির খাতার মলিন পাতায়
ঘেরো খাতা।
যে খাতাতে লেখা আছে
কবে কখন দেখা হতো রৌদ্র ছায়ায়।
ফিরিয়ে দেবো উপহারের নীল উপহাস
রঙিন সুতোর মলিন রুমাল।
কাঁচা হাতের
কাঁচা লিখন।
ভুল বানানের প্রিয়তম
ভুল বুঝোনা আমায় তুমি
কালের খেয়ায় দেখা হবে,
দেখা হবে তোমার আমার
যদি আর কটা দিন বেঁচে থাকি।

ঘুম ভাঙো পুনর্বার

মনজুরুর রহমান

বন্ধুর মুখোশ পরা শত্রুরা ঘিরে আছে চৌদিক!
জুডাস মীর জাফর আর–
খন্দকার মোশতাক অদৃশ্য প্রেতাত্মা হয়ে
গ্রাস করছে বিস্তীর্ণ বাংলাদেশ...!
কিম্ভূত হিংস্র ঈগল যেন যুদ্ধবিমানের মতো
প্রসারিত কালো ডানা তীক্ষ্ণ চঞ্চু সমেত–
শিবের নাচন নাচে কালবৈশাখির।
হে প্রিয় স্বদেশ, তুমি জেনে ঋদ্ধ হও:
বিষধর সর্পগণ আবারো তুলছে ফণা
তোমাদের বধিবে বলে!
রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘের মতন তাহাদের
চোখ ও জিহ্বায় লোভ চমকায় বিদ্যুতের মতো।
আমাদের দেখা হবে ভিন্ন রণাঙ্গনে–
প্রিয় পিতৃভূমি বাংলা স্বদেশ আমার।
ঘুম ভেঙে পুনর্বার জেগে ওঠো–
কুম্ভকর্ণের মতন।

ভুলে যাওয়া নাম

রোকসানা গুলশান

দুলছি আমি, সুরের ধারায়
দুলছে যে পাতারাও।
রক্তে-শিরায় যে আলাপ
শুনতে কি তা পাও?
সেই নাম ধরে ডাকো যদি আজ
দিয়েছিলে যা আদরে
খুঁজি আমি তাই, স্থায়ীকে যে চাই
আভোগের রেশ ধরে।
যে আনন্দে, আলো দিয়ে
সাজিয়েছ শিশু সাজে।
কৃপণের মতো সে আলোকে ঢেকে
বাড়িয়েছি আজেবাজে।
অন্যমনে, অবিশ্বাসে
ভুলে গেছি নিজেকেই।
ডাকো যদি সেই নাম ধরে আজ
কাঁপা প্রাণে সাড়া দেই।
ঘষে, মেজে, ধুয়ে নামটারে ফিরে
নিতে যেন পারি চিনে।
ভুলে না যাই, ভুলে যাওয়া নাম
দয়া করো দীনহীনে।
আছি কি-না নাই, ভেঙে সেই বোধ
আবার মানুষ হই,
যতবার ডাকো, ততবারই যেন
তোমারই আমি।

হেমন্তের নবান্ন: মাঠে মাঠে কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা

নূরুল হক

হেমন্তের মাঠ থেকে কৃষকরা ঘরে তোলে নতুন ফসল। রাখালেরা গরু-মহিষের পাল ছেড়ে দিয়ে মেতে ওঠে ডাংগুলি-গোল্লাছুট খেলায়। সমস্ত মাঠ ছাপিয়ে সোনার ধানের আভা শেষ বিকেলে পশ্চিম আকাশকে পর্যন্ত রাঙিয়ে দেয়। মানুষের মনে আনন্দ আর ধরে না। গ্রামবাংলার এই নির্মল আনন্দে সৃষ্টির উল্লাসে শামিল হন কবিরাও। তাই আজ ফসল তোলার পাশাপাশি হেমন্তের মাঠে মাঠে কবিতার পঙ্‌ক্তিমালা খুঁজে বেড়াব।

সোনালি ধান আর নবান্নের ঘ্রাণ–ভরে যায় মন

হৈমন্তিক কবিতা খোঁজার আগে মনে পড়ে কৃষিপ্রধান এ দেশের জীবনযাত্রার রূপ। কৃষিকাজেরও রয়েছে নানা ধরন– অবশ্যই তা প্রকৃতি ও ঋতুভেদে। আর এই ঋতুচক্রের হিসাব মতে, কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মিলে হেমন্ত। এর আগে শরৎ, পরে শীত। বাংলার ফসল তোলার ঋতু হেমন্ত। কিন্তু কেবল ফসল তোলার নয়, সৃজনেরও। বর্ষা থেকে শরতের মাঝামাঝি পর্যন্ত চলে কৃষক-শ্রমিকের অক্লান্ত পরিশ্রম। বর্ষার শেষ দিকে বোনা হয় আমন-আউশ। পুরো শরৎ বেড়ে ওঠার কাল। হেমন্তের প্রথম মাস কার্তিকে ধান পরিপক্ব হয়। সম্রাট আকবর হেমন্তের শেষ মাস অগ্রহায়ণকেই প্রথম মাস ঘোষণা করে খাজনা তোলার প্রচলন করেছিলেন। হেমন্ত বাংলার কৃষকদের কর্মচাঞ্চল্য ফিরিয়ে দেয়। আর কবিদের দেয় অফুরন্ত কল্পনাশক্তির অনুষঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, জসীমউদদীন, জীবনানন্দ দাশ থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের অনেক কবিই লিখেছেন এই হেমন্ত নিয়ে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, ঋতুচক্র প্রকৃতিতে বিপুল পরিবর্তন সাধন করে। একই সঙ্গে মানবমনেও এর প্রভাব ফেলে। এই পরিবর্তন সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে ঘটে না। সাধারণ মানুষ কখনো কখনো আনন্দ-উচ্ছ্বাস, দুঃখ-বেদনা অনুভব করে মাত্র। ওই অনুভব তার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কিংবা বন্ধু-আত্মীয়দের কাছে কিছুটা প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি যাকে ভাবুক বানিয়েছে, যাকে করে তুলেছে নিখিলের শিল্পী, সে সৃষ্টিশীল মানুষটি যদি বিশেষ করে কবি হন, তাহলে তাঁর মনোজগতে ঘটে যায় বিপুল পরিবর্তন। তিনি উপস্থিত কালের মুহূর্ত মাত্র আগের সময়ের সঙ্গে মুহূর্ত পরের সময়েও আবিষ্কার করেন পরিবর্তনের সূচকগুলো। এদিক থেকে বলা চলে হেমন্ত সাধারণ মানুষের কাছে নিছক ফসল কাটার ঋতু হলেও, কবির কাছে সৃষ্টি-বিরাম-প্রাণের উচ্ছলতার নাম।

রবীন্দ্রনাথ মূলত ভাববাদী কবি। তাঁর এই ভাববাদ প্রেম, পূজা পর্বের মতো প্রকৃতি, নিসর্গ ও ঋতুচক্রেও স্পষ্ট। তিনি ঋতুর ভেতর নানা রূপ ও বর্ণের খেলা যেমন লক্ষ করেছেন, তেমনি দেখেছেন প্রকৃতির লীলালাস্যও। তাঁর একটি বিখ্যাত গানের নাম 'হিমের রাতে'। গানটিতে তিনি বলেছেন, 'হিমের রাতে ওই গগনের দীপগুলিরে,/হেমন্তিকা করল গোপন আঁচল ঘিরে।/ঘরে ঘরে ডাক পাঠালো 'দীপালিকায় জ্বালাও আলো,/জ্বালাও আলো, আপন আলো, সাজাও আলোয় ধরিত্রীরে'। অর্থাৎ হেমন্তের আগমনে প্রকৃতিতে পরিবর্তন এসেছে। রাতে তারার আলো হেমন্তের মৃদু কুয়াশায় আড়াল হয়ে গেছে। তবে ঘরে ঘরে আহ্বান এসেছে, আলো জ্বালানোর। সে আলো যেন আত্ম-উদ্‌বোধনের হয়। আত্ম-আবিষ্কৃত আলোয় পৃথিবীকেও সাজাতে হবে। কোনো ধার-করা আলোয় নয়। আবার 'নৈবেদ্য স্তব্ধতা'য় বলেছেন, 'আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে/জনশূন্য ক্ষেত্র মাঝে দীপ্ত দ্বিপ্রহরে/শব্দহীন গতিহীন স্তব্ধতা উদার/রয়েছে পড়িয়া শ্রান্ত দিগন্ত প্রসার/স্বর্ণশ্যাম ডানা মেলি'। কবির মতে, হেমন্তে সোনালি ফসলে প্রকৃতির আভায় নতুন ছবি ফুটে উঠেছে। সেখানে আছে এক অনাবিল প্রশান্তি। যেখানে জনমানব নেই। নেই কোনো শব্দ, গতি, রয়েছে স্তব্ধতা। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মদর্শন এই হেমন্তকেন্দ্রিক গান-কবিতায়ও সুস্পষ্ট।

হেমন্তের আগমনী, এর প্রকৃতি ও স্বভাবের এক চঞ্চল রূপ এঁকেছেন কাজী নজরুল ইসলাম 'অঘ্রাণের সওগাত' কবিতায়। নজরুল ইসলাম এই কবিতায় কেবল হেমন্তের প্রকৃতির ছবিই আঁকেননি, একই সঙ্গে পারিবারিক সংস্কৃতির চিত্রও তুলে ধরেছেন। ফসল ঘরে তোলার সঙ্গে সঙ্গে কৃষান-কৃষানির মনে যে আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায় তার বর্ণনা যেমন আছে, তেমনি আছে নবান্ন উপলক্ষে বাড়ির মেয়ে জামাইকে নিমন্ত্রণ করার চিরায়ত রূপটিও। নজরুল হেমন্তের দিনের চেয়ে রাতের সৌন্দর্যে বেশি মোহিত। তাই তাঁর পঙ্‌ক্তি 'চাঁদের প্রদীপ জ্বালাইয়া নিশি জাগিছে একা নিশীথ/নতুন পথে চেয়ে চেয়ে হল হরিৎ পাতারা পীত।' কবি চাঁদকে দেখেছেন প্রকৃতির আলোর উৎস হিসেবে। যেখানে চরাচরে বসবাসরত মানুষেরা অপেক্ষা করে অপার সৌন্দর্য উপভোগের আশায়।

সুফিয়া কামাল সহজ-সরল ভাষায় 'হেমন্ত' কবিতায় বলেছেন,

সবুজ পাতার খামের ভেতর
হলুদ গাঁদা চিঠি লেখে
কোন্ পাথারের ওপার থেকে
আনল ডেকে হেমন্তকে?

তাঁর বর্ণনায় বিস্ময় রয়েছে, একই সঙ্গে রয়েছে প্রশ্নও। কবির মতে, বাংলাদেশ চিরসবুজের দেশ। আদিগন্ত সবুজের হাতছানি এদেশে। মাঠ থেকে পাহাড়, ক্ষেত থেকে প্রান্তর। বাড়ির ওঠোন থেকে বাগান সর্বত্র সবুজের সমারোহ। অথচ এই সবুজের ভেতরই যেন হঠাৎ করেই হলুদবরণ এক ঋতু এসে পড়েছে। তবে এই হলুদ জীবন সায়াহ্নের বার্তা বয়ে আনে না। নিয়ে আসে জীবনের অনন্য প্রাপ্তি। মানুষের বেঁচে থাকার অবলম্বন সোনারং ধান। কবির মতে, হেমন্ত নিজে নিজে আসে না। তাকে রীতিমতো পত্রযোগে নিমন্ত্রণ করে আনতে হয়। কারণ চিরসবুজের দেশে এই ঋতু সোনা আভা ছড়িয়ে দেয়। বদলে দেয় প্রকৃতির রূপ।

ষোলোআনা হেমন্তপ্রেমী কবি জীবনানন্দ দাশ। তাঁর কবিতায় হেমন্ত, প্রকৃতি আর আত্মমগ্ন একে অন্যের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। জীবনানন্দ দাশের কবিতায় হেমন্ত প্রসঙ্গে মূল্যায়ন করতে গিয়ে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন কবি নরেশ গুহ। তিনি 'হেমন্তের কবি জীবনানন্দ দাশ' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'জীবনানন্দের কবিতা পড়তে পড়তে অজান্তে কখন আমরা সেই রূপসী হেমন্তের প্রেমে পড়ে যাই। ভেবে অবাক লাগে, কৃষির সোনার কৌটোতে আমাদের প্রাণের ভ্রমরটি যদিও ভরে রাখা আছে তাহলেও ফলন্ত ধানের ঋতু হেমন্তের গাথা বাংলা কবিতায় একরকম ব্যতিক্রম বললেই চলে। শুধু কি দৃশ্যের? গন্ধের, শস্যের, আলস্য-পূর্ণতা-বিষাদের করুণামাখা লাবণ্যময়ী ঋতু হেমন্ত। বাংলার কাব্য বর্ষার স্তুতিতে, বসন্তের বন্দনায় মুখর এবং সে দুটি বিশেষ ঋতুই বিখ্যাত আরো অনেক কিছুর মতো জীবনানন্দের কবিতায় অনুপস্থিত। হেমন্তের গভীর গম্ভীর রূপ কীটস-এরও প্রাণ ভুলিয়েছিল। শেষ পর্বে জীবনানন্দের কাব্যে যখন জন্মান্তর ঘটছে, হেমন্ত তখনো তাঁর উপকরণ হয়েছিল, তার ব্যবহার যদিও তখন ভিন্ন। হেমন্ত প্রথমত শস্যের, তৃপ্তির, বিরতির ঋতু। আর এই শস্যভরা ঋতুকে সবচেয়ে বেশি মহিমান্বিত করেছেন জীবনানন্দ দাশ। কবি হেমন্তকে দেখেছেন প্রেমে-কামে, দেহে-দেহহীনতায়, সৃষ্টিতে, তৃপ্তিতে, বিরহে, বিরতিতে। 'পিপাসার গান' কবিতায় লিখেছেন, 'এ দেহ অলস মেয়ে/পুরুষের সোহাগে অবশ/চুমে লয় রৌদ্রের রস/হেমন্ত বৈকালে/উড়ো পাখপাখালির পালে/উঠানের পেতে থাকে কান, শোনে ঝরা শিশিরের ঘ্রাণ/অঘ্রাণের মাঝরাতে'। হেমন্ত রাতের নৈঃশব্দ স্পষ্ট করার জন্য কবি ঘ্রাণ শক্তির সঙ্গে শ্রবণশক্তির মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। তাঁর কবিতায় হেমন্তের কিছু অনুষঙ্গের ব্যবহার এত প্রচুর যে, তাঁকে হেমন্তের কবি বলে আখ্যায়িত করলেও ভুল হবে না। 'ধান কাটা', 'নবান্ন', 'ইঁদুর', 'শালিক', 'লক্ষ্মীপেঁচা', 'নির্জন স্বাক্ষর', 'কার্তিকের নীল কুয়াশায়', 'শামুক গুগলিগুলো প'ড়ে আছে শ্যাওলার মলিন সবুজে', 'হেমন্ত এসেছে তবু', 'অঘ্রাণের প্রান্তরে', 'প্রচুর শস্যের গন্ধ বুকে তার থেকে আসিতেছে ভেসে/পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণে ভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশ', 'হেমন্তের রৌদ্রের মতন/ফসলের স্তন/আঙুলে নিঙাড়ি'র এমন কিছু শব্দ, শব্দবন্ধ, বাক্যাংশ, বাক্য জীবনানন্দ দাশের হেমন্তপ্রেমী সত্তার পূর্ণ বিকিরণ ঘটিয়েছে। গোধূলিসন্ধির নৃত্য' কবিতায় লিখেছেন–

> সেই খানে উঁচু উঁচু হরীতকী গাছের পিছনে
> হেমন্তের বিকেলের সূর্য গোল-রাঙা-
> চুপে চুপে ডুবে যায়-জ্যোৎস্নায়।
> পিপুলের গাছে বসে পেঁচা শুধু একা
> চেয়ে দেখে; সোনার বলের মতো সূর্য আর
> রুপার ডিমের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ দেখা।

এখানে লক্ষণীয়, হেমন্তের ছবি আঁকতে গিয়ে কাজী নজরুল ইসলাম যেমন চাঁদকে উপজীব্য করেছেন, তেমনি জীবনানন্দও। উভয়েই চাঁদের রূপের বর্ণনা দিয়েছেন মানুষের সৌন্দর্যবোধের সঙ্গে মিল রেখে। তবে উপমায়-চিত্রকল্পে নজরুল জীবন্ত-প্রাণচঞ্চল হলেও জীবনানন্দ অনেক বেশি হৃদয়ের, বাস্তবের, মাঠের।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বুদ্ধিবৃত্তিক কবি। ভাবালুতার চেয়ে যুক্তিকে প্রাধান্য দেন তিনি। তাঁর 'হৈমন্তী' কবিতায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। যদিও তিনি অন্যান্য বাঙালি কবির মতো এদেশের আলো-হাওয়ায় বেড়ে উঠেছেন। গড়ে উঠেছে তাঁর মানসপ্রকৃতি। তবু এক প্রজ্ঞার অনুশাসন তাঁকে অন্যান্য কবি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রেখেছে। তাঁর কবিতায় হেমন্ত নিছক কোনো আবেগ নিয়ে উপস্থিত হয় না। সমগ্র প্রকৃতির ভেতর দার্শনিক ও শারীরিক সত্য উদ্ভাসিত হয় এখানে। তিনি হেমন্তে দেখেন ধূমায়িত মাঠ। তাই লেখেন, 'ধূমায়িত রিক্ত মাঠ, গিরিতট হেমন্তলোহিত/তরুণ-তরুণীশূন্য বনবীথি চ্যুত পত্রে ঢাকা,/শৈবালিত স্তব্ধহ্রদ, নিশাক্রান্ত বিষণ্ন বলাকা/ম্লান চেতনারে মোর অকস্মাৎ করেছে মোহিত'। তাঁর মতে হেমন্তের মাঠ রিক্ত। তবু এ ঋতুর নিশ্চুপ স্বভাব, বিষণ্ন পাখিদের ভাষা তাঁকে সহসা মুগ্ধ করে। বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার সমীকরণ শেষে কবি শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেন, 'আজি আর ফিরিব না শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে'। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যুক্তিবাদী, বাস্তবনিষ্ঠ। তাই নিষ্ফল পরিশ্রমে তাঁর আগ্রহ নেই। তাঁর এই বক্তব্যের সারবত্তা রয়েছে। কারণ হেমন্ত এমন এক ঋতু, যখন কৃষকেরা পরিশ্রম করে মূলত ফসল ঘরে তোলার। এই সময়ের কোনো পরিশ্রমই বিফলে যায় না। প্রতিটি পদক্ষেপই গুরুত্বপূর্ণ এবং যথাযথ ফল বয়ে আনে।

বিষ্ণু দের হেমন্তকল্পনা একটু ভিন্ন রকমের। তাঁর মতে, 'দিনগুলি ক্লান্ত হতাশ্বাস/হেমন্তের কুষ্ঠরোগে গতপত্র অরণ্যের মতো'। শামসুর রাহমানের কাছে হেমন্ত জীবনানন্দীয় অনুভবের ঠিক বিপরীত মেরুতে। তাঁর হেমন্তে কেবল নগরে চাঁদের আলোই দেখা যায়। আল মাহমুদের কবিতায় হেমন্ত এসেছে মানুষের প্রেমে-কামে প্রকৃতির সৌন্দর্যে। তাঁর কাছে হেমন্ত এক ধরনের পরিপূর্ণতার নাম। যখন চরাচরের বিস্ময় ও পরিশ্রম এবং সৃষ্টি আর আত্মতৃপ্তি একে অন্যের সঙ্গে একাকার হয়ে যায়। 'আঘ্রাণ' কবিতায় লিখেছেন, 'আজ এই হেমন্তের জলদ বাতাসে/আমার হৃদয়মন মানুষীর গন্ধে ভরে গেছে।/রমণীর প্রেম আর লাবণ্যসৌরভে/আমার অহংবোধ ব্যর্থ আত্মতুষ্টির ওপর/বসায় মর্চের দাগ, লাল কালো/কটু ও কষায়।' অর্থাৎ হেমন্তের কোমল হাওয়ায় কবিমনে এক ধরনের অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে। যে অনুভূতি কবিকে নিয়ে যায় মাটির মানুষের দেহের ঘ্রাণের কাছে। তাঁকে মনে করিয়ে দেয় সৃষ্টি-ফসল ও তৃপ্তির সার্থকতার কথা। যেখানে ভালোমন্দের স্মৃতি হাত ধরাধরি করে চলে। তাঁর কাছে প্রেম ও কাম একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। তাই তিনি স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েন। মনে পড়ে তাঁর কৈশোরের প্রেম। মনে পড়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যরাজির আদিগন্ত শোভা।

তবে হেমন্ত নিয়ে সবচেয়ে ব্যতিক্রম আর স্মরণীয় পঙ্‌ক্তি লিখেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। তিনি ব্রাত্যধারার মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছেন। লিখেছেন, 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান'। এর মাধ্যমে তিনি মানবপ্রেমের নতুন পথ উন্মোচন করেছেন। ফসল কাটার খবর নিয়ে আসতে চেয়েছেন কৃষকের ঘরে ঘরে। কবিতার শুরু এভাবে–

> হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান ঘুরতে দেখেছি অনেক।
> তাদের হলুদ ঝুলি ভরে গিয়েছিলো ঘাসে আবিল ভেড়ার পেটের মতন
> কতকালের পুরোনো নতুন চিঠি কুড়িয়ে পেয়েছে
> অই হেমন্তের অরণ্যের পোস্টম্যানগুলি
> আমি দেখছি, কেবল অনবরত ওরা খুঁটে চলেছে
> বকের মতো নিভৃতে মাছ।
> এমন অসম্ভব রহস্যপূর্ণ সতর্ক ব্যস্ততা ওদের-
> আমাদের পোস্টম্যানগুলির মতো নয় ওরা
> যাদের হাত হতে অবিরাম বিলাসী ভালোবাসার চিঠি আমাদের হারিয়ে যেতে থাকে।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় হেমন্তকে উপস্থাপন করেছেন একটি বিশেষ কালের প্রতিনিধি হিসেবে। এই সময়ে মানুষের মনে যে কর্মচাঞ্চল্য ও প্রত্যাশার সম্মিলন ঘটে তাকে চিত্রায়িত করেছেন কবি।

বাংলা কবিতার বিপুল ভাণ্ডার থেকে তুলে আনা পঙ্‌ক্তিমালা পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে, হেমন্তকে কবিতার ঋতু করে তুলেছেন একান্তভাবে জীবনানন্দ। তাঁর কবিতায় 'ধান কাটা', 'নবান্ন', 'ইঁদুর', 'শালিক', 'লক্ষ্মীপেঁচা', 'নির্জন স্বাক্ষর', 'কার্তিকের নীল কুয়াশায়' প্রভৃতি শব্দ ও শব্দবন্ধ হেমন্তের চিত্র এমনভাবে তুলে ধরে যে, জীবনানন্দ পাঠ করলে পুরো হেমন্তের চিত্রই ফুটে ওঠে।

প্রকৃতির রূপ বৈচিত্র্যের ভেতর হেমন্ত একেবারেই এক লাজুক ঋতু। এ সময়ে মানুষ মূলত ফসল তোলার কাজে একাগ্র থাকে। সৃষ্টিশীল মানুষরাও নিভৃতে চর্চা করে শিল্পের। হয়ত এ কারণেই দেখা যায়, লাজুক জীবনানন্দের কবিতায় হেমন্তের এমন বিচিত্র উপস্থিতি। বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিরা হেমন্তকে দেখেছেন ফসল তোলার ঋতু হিসেবে, সৃষ্টির মাহেন্দ্রক্ষণ হিসেবেও। তাই হেমন্ত হয়ে উঠেছে কবিদের ধ্যানস্থ হওয়ার সময়। যে সময়ে অনেকটা চুপিসারে, নিঃশব্দে কবির মনে, হৃদয়ে, মগজে কবিতার ছায়া এসে উপস্থিত হয়। তাই হেমন্তের কবিতা বর্ষা বা বসন্তের কবিতার চেয়ে তুলনায় কম। কিন্তু যে কটি কবিতা রচিত হয়েছে, সে কটি চিত্রকল্পে-উপমায়-বিষয়ে অনন্য।

লেখক: কবি ও কথাসাহিত্যিক

আমাদের পিঠাপুলি আমাদের ঐতিহ্য

মোনাজিনা জান্নাত

আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা বিশাল ও বৈচিত্র্যময়। মাছে-ভাতে বাঙালির তকমাতো আছেই, সাথে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের নানা ধরনের মুখরোচক খাবারের সম্ভারে সজ্জিত হয়ে আমাদের খাবারের ডালাটি দিনে দিনে আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠছে। খাদ্য প্রস্তুত এবং খাদ্য পরিবেশনাতেও এসেছে শৈল্পিক ছোঁয়া। এই তালিকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করে আছে নানা স্বাদ, গন্ধ, আকারের পিঠা। ঋতুর পরিবর্তনে পিঠারও পরিবর্তন হয়। বিভিন্ন পালা-পার্বণের একান্ত অনুষঙ্গ হয়ে যুগ যুগ ধরে টিকে আছে লোভনীয় এই খাদ্যবস্তু। শুধু তাই নয়, গৃহস্থালির গণ্ডি ছেড়ে বাণিজ্যিক ঘরানায় প্রবেশ করে অনেক মানুষের কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

বৈশাখি মেলা, গায়ে হলুদসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে আজকাল পিঠা প্রসঙ্গটি চলে আসে। তবে হেমন্ত ও শীতকালে যেন উৎসবে পরিণত হয়। গ্রামে গ্রামে চলে পিঠাপুলির ধুম, শহরে আটপৌরে জীবনেও এসে যার ছোঁয়া লাগে। ইদানিং পিঠা বিক্রেতাদের কল্যাণে শহরের বিভিন্ন মোড়, অলিগলিতেও পিঠা কিনতে পাওয়া যায়। নভেম্বর মাস, শীত আসি আসি করছে। ইতোমধ্যেই রসনা-বিলাসীদের মাঝে সাড়া ফেলে দিয়েছে পিঠার বার্তা। ভাপা, চিতই, দুধ চিতই, পাটিসাপটা, নানা ধরনের পুলি, তেল বা পাকান, নকশি গোকুল, জামাই, বিবিখানা পিঠা, খেজুর, মাছ, ঝিনুক, ঝাল, মেরা, ফুলঝুরি, গোলাপ, নোনাস, মুগডালের নকশি, ভিজানো নকশি, ফুল, পাতা, গড়গড়া, লবঙ্গলতিকা– এ ধরনের কতশত পিঠার ভারে পরিপূর্ণ আমাদের পিঠার ঝুলি। তাল বড়া, কাঁঠালের পিঠা এদের কথা না হয় বাদই দিলাম। এ সকল পিঠা স্বাদে-গন্ধে এতটাই বৈচিত্র্যময় যে তা সহজেই সবার নজর কাড়ে। পিঠাগুলো তৈরিতে বাঙালি রমণীর যে নৈপুণ্য ও যত্নের ছোঁয়া পাওয়া যায় তা যেন সৃষ্টিশীল শিল্পকর্মের অনন্য নমুনা। পাশ্চাত্যে পিঠা বলতে কেক বা পাই বোঝালেও বাঙালির পিঠা সে মাত্রাকে ছাড়িয়ে যায় বিভিন্ন আঙ্গিকে।

ভাপা পিঠা: বাষ্পের ভাপে তৈরি হয় বলেই হয়ত এর নাম ভাপা পিঠা। অনেকে একে ধুপি পিঠাও বলে থাকেন। এতে সাধারণত গুড় এবং কোড়ানো নারিকেল দেওয়া হয়। শীতের দিনগুলোতে চুলার পাশে বসে ধোঁয়া ওঠা গরম গরম ভাপা পিঠা খাওয়ার অভিজ্ঞতাই আলাদা।

চিতই পিঠা: গনগনে চুলার আগুনের তাপে ফোঁড় ওঠা পিঠাটাই চিতই পিঠা। গরম গরম চিতই পিঠা নানারকম ভর্তা, খেজুরের গুড় অথবা লালি (তরল খেজুরের গুড়) দিয়ে খেতে খুবই সুস্বাদু লাগে। অনেকে চিতই পিঠা তৈরির সময় গোলানো আটায় কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ-রসুন-আদা বাটা, হলুদ, লবণ আর ডিম দিয়ে ঝাল চিতই তৈরি করেন।

অনেক সময় মাটির পাত্রের গায়ে ছোটো ছোটো খোপ থাকে। এতে একসঙ্গে কয়েকটি পিঠা বানানো যায়। একে তখন সাতপুথি পিঠা বলে। চিতই অথবা সাতপুথি পিঠাকে দুধ আর খেজুরের গুড়ে ভিজিয়ে দুধ চিতই তৈরি করা হয়।

পাটিসাপটা পিঠা: পাটির মতো মোড়ানো হয় বলে হয়তবা পিঠাটির নাম পাটিসাপটা। মাঝখানে ক্ষির দেওয়া এই পিঠাটি খেতে খুবই সুস্বাদু।

নানা ধরনের পুলি: আটা দিয়ে পুর তৈরি করে এতে নারিকেল কোড়া/আলু ভাজি, সিদ্ধ ছোলার ডাল ঢুকিয়ে তেলে ভেজে তৈরি করা যায় নানা ধরনের পুলি পিঠা। নারিকেল কোড়ায় তৈরি পুলি পিঠাটি দুধ আর খেজুরের গুড়ে ভিজিয়ে রেখে দুধ পুলি তৈরি করা যায়।

তেল পিঠা বা পাকান পিঠা: এ পিঠাটি সারাবছর খাওয়া হয়। ছোটো-বড়ো সকলেই এ পিঠাটি খেতে খুবই পছন্দ করে। গুড়ের বদলে ঝাল-লবণ দিয়ে তৈরি তেলে ভাজা ঝালের পিঠাও খুব সুস্বাদু। রংপুর অঞ্চলে চালের আটায় তেল, লবণ, হলুদ, কাঁচা মরিচ দিয়ে খামির তৈরি করে রুটির মতো বেলে গোল করে কাটার পর তেলে ভেজে এ ধরনের পিঠা তৈরি করা হয়। এর নাম নোনাস বা নোনতা পিঠা।

জামাই পিঠা: কিছুটা বড়ো, তেলে ভাজা এই পিঠাটির নাম শুনলে মনে হবে শুধু যেন জামাইদের আপ্যায়নে এই পিঠাটি তৈরি করা হয়। আবার এরই সাথে মিল রেখে বিবিখানা নামের আরো একটি পিঠার প্রচলন আছে।

গোলাপ পিঠা: গোলাপের পাপড়ি মেলা পিঠাটির নাম গোলাপ পিঠা। চিনির রসে ভিজিয়ে এই দারুণ পিঠা তৈরি করা হয়।

নকশি পিঠা: বিভিন্ন ছাঁচের নকশাদার ছাড়াও খেজুর, ঝিনুক, মাছ, পাতা, ফুল নামের নকশি পিঠাগুলোও নান্দনিকতায় আমাদের মন কেড়ে নেয়।

আছে তালের পিঠা, কাঁঠালের বড়া, গড়গড়া, লবঙ্গলতিকা। পিঠার রাজ্যের বিশাল বিস্তৃতি। এ খাদ্যবস্তুটি আমাদের রসনাকে যেমন পরিতৃপ্ত করে তেমনি নান্দনিক শিল্পের ছোঁয়ায় কেড়ে নেয় পর্যটকদের মন। তাই এর অর্থনৈতিক গুরুত্বের কথাও ভাববার সময় এসেছে বৈকি!

লেখক: প্রাবন্ধিক

কাঞ্চনজঙ্ঘার বুকে পাখি

ড. আ ন ম আমিনুর রহমান

দুটো বিশেষ লক্ষ্য সামনে রেখে বড়ো ভাই মিজানুর রহমানসহ ২০১৭-এর ৯ই নভেম্বর রাতে পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ার উদ্দেশে বাসে চাপলাম। কিন্তু রাস্তা খারাপ থাকায় সময়মতো তেতুলিয়া পৌঁছুতে পারলাম না। ফলে যা হওয়ার তাই হলো। অগ্রগামী টিমের ছয়জন আমাদের ছাড়াই তুলসিয়া বিলে চলে গেল। কী আর করা! আমরা বাস থেকে নেমে নাস্তা সেরে সোজা রেস্ট হাউজে চলে গেলাম। কিছুক্ষণ পর ফ্রেশ হয়ে বাংলাবান্ধার উদ্দেশে অটোতে চাপলাম। বাংলাবান্ধা যাওয়ার পথে বহু প্রতীক্ষিত প্রথম লক্ষ্য কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা মিলল। কিন্তু রোদের আলোয় কেমন যেন একটা জ্বলা জ্বলা ভাব থাকায় ছবি তুলে মন ভরল না। কাজেই পরের দিন ভোরের অপেক্ষায় থাকলাম।

বাংলাবান্ধা যাওয়ার পথে জিরো পয়েন্টের কয়েক কিলোমিটার আগে আমাদের অটো হাতের ডানে মোড় নিয়ে আধাপাকা রাস্তা ধরে এগিয়ে চলল। কিছুক্ষণ পর তিরনহাট ইউনিয়নের ধাইজান প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে এসে পৌঁছুলাম। মাঠের পাশের ধানক্ষেতে বহু কাঙ্ক্ষিত কালো দোচরা পাখিদের জন্য বহুক্ষণ অপেক্ষা করেও দেখা মিলল না। কাজেই ফের বাংলাবান্ধার দিকে পা বাড়ালাম। কিছুক্ষণ পর আমাদের দলের দুজন ওদের মাথার ওপর দিয়ে দুটো কালো দোচরাকে উড়ে যেতে দেখল। কিন্তু মোটর সাইকেলে থাকায় ছবি তুলতে ব্যর্থ হলো। যাহোক বাংলাবান্ধার কাছে রেস্টুরেন্টে দুপুরের খাবার সেরে সেই অটোতেই প্রায় পনেরো কিলোমিটার দূরের শালবাহান ইউনিয়নের দিকে রওয়ানা হলাম।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক পর রোদেলা বিকেলে শালবাহান ইউনিয়নের তুলসিয়া বিলে পৌঁছুলাম। চমৎকার বিল। পাশে দিগন্ত বিস্তৃত ধানক্ষেত। মাঝে মাঝে রয়েছে নানা প্রজাতির গাছ ও জলজ উদ্ভিদ। বিলের পানি ছেয়ে আছে পানিকলার সাদা ফুলে। অত্যন্ত সুন্দর লাগছে দেখতে। বিল ও ধানক্ষেত ছাড়িয়ে পেছনে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে ভারতের দার্জিলিংয়ের কার্সিয়াং পাহাড়। তারও পেছনে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে বরফময় শ্বেতশুভ্র হিমালয়ের তৃতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘা। এমন নৈসর্গিক সৌন্দর্যের বিল এ জীবনে খুব কমই দেখেছি।

বিল ও ধানক্ষেতজুড়ে প্রচুর আবাসিক ও পরিযায়ী পাখির সমাগম ঘটেছে। বিলের এক প্রান্তে বড়ো একটি গাছে পানকৌড়ি ও সাদা বকের ঝাঁক বসে আছে। বিলের ঠিক সামনে কাঁটা-ঝোপের মধ্যে লালগলা চটক ও টুনটুনির দেখা পেলাম। ধানক্ষেতের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকশ পরিযায়ী ধূসর-মাথা হট্টিটি। বিলের পানিতে ভেসে বেড়াচ্ছে সরালিসহ তিন প্রজাতির হাঁস ও জলমুরগি। শাপলা পাতার ওপর হেঁটে বেড়াচ্ছে সুদর্শন জলপিপি। শিকারের জন্য ঠায় দাঁড়িয়ে আছে কানিবক। মাঝে মাঝে তিলা ও ধবল ঘুঘু আসা-যাওয়া করছে। বিলের মধ্যে একটি উঁচুমতো জায়গায় খড়ের স্তূপ রাখা আছে। স্তূপের ঠিক ওপরে নীল-খয়েরি-সাদা রঙের সাদাগলা মাছরাঙা পাখি বসেছিল। হঠাৎ একই প্রজাতির আরেকটি পাখি এসে ওর পাশে বসলো। মুহূর্তের মধ্যে কী হলো কে জানে? দুটির মধ্যে শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ। দারুণ সে দৃশ্য! একটি আরেকটিকে এই ঠোকর মারছে তো আবার ধাওয়া করছে। অন্যটিও থেমে নেই, সমুচিত জবাব দিচ্ছে। ধূসর টিটির ঝাঁকে উত্তুরে টিটি খুঁজতে গিয়ে যুদ্ধের পুরো চিত্র ক্যামেরার ভিউ ফাইন্ডারে উপভোগ করলাম। আর শাটারে সমানে ক্লিক করে গেলাম। কিন্তু পেছনে দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে থাকা কাঞ্চনজঙ্ঘার বুকে ওড়া কোনো পাখির ছবি তুলতে পারলাম না। এটাই ছিল আমার দ্বিতীয় লক্ষ্য। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নেমে আসায় তুলসিয়া বিল পিছনে ফেলে তেতুলিয়ায় শিক্ষা বিভাগের রেস্ট হাউজের দিকে পা বাড়ালাম।

এবার তেতুলিয়া সফরে এসে বেশ কয়েকটি পয়েন্ট থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখেছি। যেমন– তেতুলিয়া ডাকবাংলো, বাংলাবান্ধা, তিরনহাট, তুলসিয়া বিল, পঞ্চগড় সদর, ঠাকুরগাঁও সদরের টাঙ্গন বেরেজ এবং দেবীগঞ্জের তেলিপাড়া চর ও মারেয়া। একেক পয়েন্ট থেকে একেক রকমভাবে দেখেছি কাঞ্চনজঙ্ঘাকে। তবে প্রায় সব পয়েন্টেই কাঞ্চনজঙ্ঘার বুকে নানা প্রজাতির আবাসিক ও পরিযায়ী পাখি উড়তে দেখেছি। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমার দ্বিতীয় লক্ষ্য পূরণ করতে পারিনি। যাহোক পরের দিন আমার লক্ষ্যগুলো পূরণ করার প্রত্যয় নিয়ে খুব ভোরে ওঠার তাগিদে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম।

উড়ন্ত একঝাঁক ধূসর টি-টি

এগারোই নভেম্বর খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে আগে থেকে ঠিক করে রাখা ইঞ্জিনভ্যানে চড়ে তেতুলিয়ার ডাকবাংলোর সামনে পৌঁছুলাম। ডাকবাংলো এলাকা একেবারে নীরব– কেউ নেই, আমরাই প্রথম।

উড়ন্ত ছোটো সরালি

ভোর সাড়ে পাঁচটায় ডাকবাংলোর সামনের কনক্রিটের বেঞ্চিতে বসে হিমালয়ের তৃতীয় সর্বোচ্চ শৃঙ্গ কাঞ্চনজঙ্ঘার (৮,৫৮৬ মিটার) অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করা শুরু করলাম। আবহাওয়া বেশ ভালো। তাই এই ভোরবেলাতেও চমৎকার ভিউ পাচ্ছি। কিন্তু অপেক্ষায় আছি সূর্যোদয়ে সূর্যের লাল আভা ওর সাদা দেহকে কতটা রাঙায় তা দেখবো বলে। গত বছর দার্জিলিংয়ের বিখ্যাত টাইগার হিলে গিয়েও মেঘের কারণে ওর টিকিটিরও দেখা পাইনি। অবশ্য ঠিক দুদিন পর কালিমপংয়ের লোলেগাঁও থেকে ভোর সাড়ে পাঁচটায় মাত্র পাঁচ মিনিটের জন্য ওর দেখা পেয়েছিলাম। তবে তেতুলিয়া থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার সঙ্গে বোনাস হিসেবে কুম্ভকর্ণ (৭,৭১১ মি.), সিনিওলচু (৬,৮৮৮ মি.) ও লামা আংডেন (৫,৮৬৮ মি.) পর্বতশৃঙ্গও দেখতে পেয়েছি। যাক, ঘড়িতে ঠিক ছয়টা বাজার সঙ্গে সঙ্গেই সূর্যি মামা উঁকি দিতে শুরু করল, আর মামার লাল আভা কাঞ্চনজঙ্ঘাকেও রাঙাতে থাকল। প্রায় বিশ মিনিট ধরে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে রাঙিয়ে ধীরে ধীরে সূর্যি মামা উপরে ওঠে গেল। আর কাঞ্চনজঙ্ঘার লালচে ভাবও আস্তে আস্তে কেটে গেল। আমার প্রথম লক্ষ্য চমৎকারভাবে উপভোগ শেষে ভ্যানে আবার ছুটলাম তেতুলিয়া থেকে দশ কিলোমিটার দূরের শালবাহান ইউনিয়নের তুলসিয়া বিলের দিকে দ্বিতীয় উদ্দেশ্য পূরণের জন্য।

যুদ্ধরত দুটি সাদাবুক মাছরাঙা

সকাল আটটা নাগাদ তুলসিয়া বিলে পৌঁছুলাম। কাঞ্চনজঙ্ঘার এত ভালো ভিউ এখানে ছাড়া অন্য কোথা থেকেও দেখিনি! তুলসিয়া বিলে বহু প্রজাতির আবাসিক ও পরিযায়ী পাখির যেন মেলা বসেছে! বিভিন্ন প্রজাতির বক, জলপিপি, সরালি, পাতারি হাঁস, মরচে রং ভূতিহাঁস, হট্টিটি, ডুবালু ও জলজ পাখিতে বিলটি যেন ভরে আছে। এদের কলকাকলি ও ওড়াউড়িতে বিলের মধ্যে যেন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। ঝাঁকে ঝাঁকে সরালি ও হট্টিটি একবার পানিতে ভাসছে তো পরক্ষণেই আকাশে উড়ছে। দেখে মনে হচ্ছে যেন ওরা কাঞ্চনজঙ্ঘার বুকেই উড়ে বেড়াচ্ছে। অথচ তুলসিয়া বিল থেকে নেপাল ও সিকিম সীমান্তে অবস্থিত কাঞ্চনজঙ্ঘার দূরত্ব কম করে হলেও ১৮০ কিলোমিটার। কাঞ্চনজঙ্ঘার সামনে বিশাল যে পাহাড়টি দেখা যাচ্ছে তা হলো দার্জিলিংয়ের কার্সিয়াং পাহাড়, তুলসিয়া বিল থেকে যার দূরত্ব প্রায় ৬১ কিলোমিটার। যাহোক, আমি বহুবার চেষ্টা করে শেষমেষ কাঞ্চনজঙ্ঘার বুকে পরিযায়ী এক প্রজাতির হট্টিটি পাখির ছবি তুলতে সক্ষম হলাম। আমার দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি সফল হলো। কাজেই এই পাখিটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা যাক।

কাঞ্চনজঙ্ঘার বুকে উড়তে থাকা পরিযায়ী হট্টিটি পাখিগুলোর নাম ধূসর টি-টি বা ধূসর-মাথা হট্টিটি। ইংরেজি নাম Grey-headed Lapwing বা Grey-headed Plover। Charadriidae পরিবারের পাখিটির বৈজ্ঞানিক নাম Vanellus cinereus।

বাংলাদেশে আবাসিক ও পরিযায়ী মিলে যে পাঁচ প্রজাতির হট্টিটি দেখা যায় ধূসর টি-টি তাদের মধ্যে বৃহত্তম। দৈর্ঘ্যে ৩৪-৩৭ সেন্টিমিটার ও ওজনে ২৩৬-২৯৬ গ্রাম। প্রাপ্তবয়স্ক পাখির মাথা-ঘাড়-গলা ও বুকের উপরের অংশ ধূসর। পিঠ বাদামি। ডানার প্রান্ত-পালকের ওপর-নিচ কালো। বুক-পেটের মাঝে একটি কালো ফিতের মতো দেখা যায়। ডানার নিচ, লেজতল ও পেট সাদা। লেজের পালক সাদা হলেও শেষ প্রান্ত কালো। চোখ লাল। ঠোঁট উজ্জ্বল হলুদ যার আগা কালো। পা ও পায়ের পাতা উজ্জ্বল হলুদ। নখ কালো। স্ত্রী-পুরুষ দেখতে একই রকম। অপ্রাপ্তবয়স্ক পাখির দেহ বাদামি। কান-ঢাকনি ছাই-ধূসর। বুকে কোনো ফিতে নেই।

ধূসর টি-টি সচরাচর দৃশ্যমান পরিযায়ী পাখি। এরা ধানক্ষেত, পতিত জমি, স্যাঁতসেঁতে চারণভূমি, অল্প পানির বিল, কর্তিত শস্যক্ষেত প্রভৃতিতে বিচরণ করে। সচরাচর বড়ো দলে দেখা যায়। তুলসিয়া বিলে যে দলটি দেখেছিলাম তাতে ২৫০-৩০০টি পাখি ছিল। এরা হেঁটে হেঁটে পোকামাকড়, কেঁচো ও শামুকজাতীয় প্রাণী খায়। ধীরে ডানা নেড়ে ওড়ে। সচরাচর করুণ সুরে তীক্ষ্ণভাবে 'চি-ইট--চি-ইট--চি-ইট---টিটিটি---কিক্-কিক্----' স্বরে ডাকে।

মে থেকে জুন প্রজননকাল। এ সময় রাশিয়া, চীন, জাপান ও এশিয়ার অন্য কয়েকটি দেশে এদের আবাস এলাকার চারণভূমি, নদীচর ও ধানক্ষেতে সামান্য গর্ত করে তাতে পাতার ডাটা বিছিয়ে বাসা বানায়। ডিম পাড়ে ৪টি। ডিমের রং অন্যান্য প্রজাতির হট্টিটির মতোই জলপাই-বাদামি, সাথে অসংখ্য ছিট-ছোপ। ডিম থেকে ছানা ফুটে বের হতে ২৮-২৯ দিন সময় লাগে। বাচ্চাগুলো বেশ ইঁচড়ে পাকা, দেহের ভেজা ভাব দূর হলেই দাঁড়িয়ে যায় ও দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। এক মাস বয়সে ওড়তে শিখে ও বড়ো পাখির দলে যোগ দেয়। আয়ুষ্কাল প্রায় নয় বছর।

লেখক: অধ্যাপক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

নিবন্ধ

চুনতি চাম্বি খাল রাবার ড্যাম: বদলে দিচ্ছে এলাকার কৃষি ও পর্যটন

মোহাম্মদ ইলিয়াছ

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। আমাদের দেশে থাকা অসংখ্য নদী ও খালে রাবার ড্যাম নির্মাণ করে শুষ্ক মৌসুমে কৃষি ও মৎস্য সেক্টরের উন্নয়নের পাশাপাশি পানির অভাব দূর করা যায়। এতে একদিকে ভূগর্ভে পানির চাপ কমবে অন্যদিকে রাবার ড্যাম এলাকায় সৃষ্টি হবে পর্যটন কেন্দ্র। রাবার ড্যাম হচ্ছে ছোটো নদী ও খালে-এর স্রোতধারায় পানি ধরে রাখার জন্য বাতাস অথবা পানি দ্বারা স্ফীত রাবার ব্যাগ। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন ছোটো নদী ও খালে বহু রাবার ড্যাম প্রকল্প নির্মিত হয়েছে। চট্টগ্রামের লোহাগাড়ায় রয়েছে ৩টি। অনেক জায়গায় রাবার ড্যাম প্রকল্পকে ঘিরে গড়ে উঠছে আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র। তার মধ্যে একটি লোহাগাড়ার চুনতি চাম্বি খাল রাবার ড্যাম।

চট্টগ্রামের চুনতি চাম্বি খাল রাবার ড্যাম

চুনতি চট্টগ্রামের লোহাগাড়া উপজেলার সর্বদক্ষিণের ইউনিয়ন। উপজেলা সদর থেকে চুনতির দূরত্ব প্রায় ৫ কিলোমিটার। ১৯২৭ সালে ইউনিয়নটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইউনিয়নটির আয়তন ৬১.২২ বর্গকিলোমিটার। চুনতি, জঙ্গল চুনতি, সাতগড়, নারিশ্চা, ফারাঙ্গা, চান্দা ও পানত্রিশা গ্রাম বা মৌজা নিয়ে চুনতি ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে– চাম্বী, চান্দা, সোনাছড়ি, হাতিয়ার, হাইছবিলা ও পাগলীর খাল এবং ফারাঙ্গা, সাতগড়, মছকানিয়া, রাতার, বুড়ির, পেকুয়ার ও নারাঙ্গীর ছড়া। চুনতি কেবল একটি জনপদ নয়, একটি সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক স্থান। এটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা ও আধ্যাত্মিকতার সংমিশ্রণে এক শিল্পিত মোহনা।

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, ঐতিহাসিক চুনতি ইউনিয়নের একটি গ্রামের নাম পানত্রিশা। এর আয়তন ৯ বর্গকিলোমিটার। চুনতি ফারাঙ্গা সড়কের পশ্চিম দিকে দেড় কিলোমিটার আঁকাবাঁকা পথ পেরুলেই দেখা যবে পানত্রিশার চাম্বি রাবার ড্যাম। ফারাঙ্গা সড়ক থেকে ঢোকার সময় চোখে পড়বে চাম্বি খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির অফিস। এ অফিস থেকে পানত্রিশা চাম্বি রাবার ড্যাম-লেকে যাওয়ার তথ্য জানা যাবে। পানত্রিশা গ্রাম দিয়ে আঁকাবাঁকা পথে বয়ে গেছে চাম্বি খাল। এলাকার কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নের জন্য পাকিস্তান আমল থেকে উক্ত খালে আড়াআড়িভাবে বাঁধ দিয়ে পানি ধরে রেখে চাষাবাদ করা হয়। তখন পানত্রিশা, ফারাঙ্গা ও নারিশ্চার কিছু জমি মিলে প্রায় ৪০০ হেক্টর জমিতে চাষাবাদ করা হতো। ১৯৯৮ সালে চুনতির তৎকালীন ইউপি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী পানত্রিশার জয়নগর এলাকার চাম্বি খালে একটি রাবার ড্যাম নির্মাণ ও রাবার ড্যামকে ঘিরে একটি পর্যটন এলাকা সৃষ্টির উদ্যোগ নেন। ঐ সময়ে প্রধানমন্ত্রীর সহকারী সামরিক সচিব (বর্তমানে সামরিক সচিব) মেজর জেনারেল মিয়া মো. জয়নুল আবেদীন বীরবিক্রম, পিএসসি'র প্রচেষ্টায় দেশের ১০টি রাবার ড্যাম প্রকল্পের মধ্যে এটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০১৫ সালে ড্যামের বাস্তবায়ন শুরু হয় এবং এই সালেই এলাকার কৃষকদের নিয়ে গঠিত হয় চাম্বি খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি। সদস্য সংখ্যা ৫৯২ জন। এলজিইডি'র অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের অধীনে ৫ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উত্তর-দক্ষিণে ২৫ মিটার দৈর্ঘ্যের রাবার ড্যামের বাঁধ দিয়ে এটি নির্মিত হয়। ২০১৮ সালের ২০শে জানুয়ারি এটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌বোধন হয়। উদ্‌বোধনের পর ড্যামের জমানো পানি দিয়ে পানত্রিশা, ফারাঙ্গা ও নারিশ্চার বহু জমিতে চাষাবাদের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, রাবার ড্যামের বাঁধের উপর মনোরম একটি ফুট ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। রাবার ড্যামের জমানো পানি উজানে সৃষ্টি করেছে আকর্ষণীয় চাম্বি লেক। লেকের জমানো পানি উজানে প্রায় ২ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। লেককে আনা হয়েছে মৎস্য প্রকল্পের আওতায়। লেকে রয়েছে ১টি স্পিড, ২টি পা-চালিত ও ১টি রাবার বোট। দর্শনার্থীরা লেকে বোট দিয়ে আনন্দ ভ্রমণ করে। দর্শনার্থীরা এটিকে বলছেন 'বিউটি অব চাম্বি লেক'। অন্যদিকে চাম্বি লেকের চারপাশ সবুজে ঘেরা। যতদূরে চোখ যায়, শুধু দেখা যায় সবুজ আর সবুজ। দর্শনার্থীদের জন্য রাবার ড্যামের আশপাশের উঁচু-নিচু পাহাড়, টিলায় ছাতা, বসার বেঞ্চ ও উন্মুক্ত গোলঘর তৈরি করা হয়েছে। ফলে ইতোমধ্যে এটি দর্শনার্থীদের কাছে বেশ সাড়া ফেলেছে। রাবার ড্যামের পাশেই রয়েছে পরিদর্শন অফিস। দর্শনার্থীরা পরিদর্শন বহিতে এই রাবার ড্যামকে ঘিরে সুন্দর-সুন্দর মন্তব্য করেছেন। দর্শনার্থীরা বলছেন, রাবার ড্যাম যাওয়ার রাস্তা সংস্কার ও রাবার ড্যামের আশপাশের এলাকায় আরো পর্যটন স্পট সৃষ্টি করা হলে এটি দেশের অন্যতম একটি পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হবে।

এ ব্যাপারে চাম্বি খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সভাপতি মাহাবুবুর রহমান চৌধুরী জানান, চাম্বি রাবার ড্যামের কারণে কৃষি, মৎস্য ও পর্যটন ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হবে। রাবার ড্যামের জমানো পানি দিয়ে প্রতি বছর ৫০০ হেক্টর জমিতে চাষাবাদ করা সম্ভব হবে।

পানত্রিশা চাম্বি খাল রাবার ড্যাম প্রকল্পের উদ্যোক্তা চুনতির সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী জানান, চুনতির পানত্রিশা, ফারাঙ্গা ও নারিশ্চা একটি অনগ্রসর এলাকা হলেও কৃষি ও পর্যটন ক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনাময়। ইতোমধ্যে রাবার ড্যাম প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় এলাকার কৃষি, মৎস্য ও কৃষকের উন্নয়ন ঘটতে শুরু করেছে। অন্যদিকে রাবার ড্যাম প্রকল্পকে ঘিরে একটি পর্যটন কেন্দ্র সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার আবু আসলাম জানান, তিনি অল্প সময়ের ব্যবধানে জেনেছেন এবং দেখেছেন প্রকৃতি যেন সমস্ত ঐশ্বর্য ঢেলে লোহাগাড়া অঞ্চলটিকে সাজিয়েছে। এই উপজেলার চুনতি ইতিহাস-ঐতিহ্যমণ্ডিত সম্ভাবনাময় একটি অঞ্চল। এই অঞ্চলের পানত্রিশা চাম্বি খাল রাবার ড্যাম প্রকল্প কৃষি-মৎস্য সেক্টরে অবদান রাখবে। পাশাপাশি উক্ত এলাকায় পর্যটন ক্ষেত্রে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে। অন্যদিকে বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে ইকোট্যুরিজম জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তাই এ বিষয়ে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি বিনিয়োগকারীরাও এগিয়ে আসলে এ খাতে উন্নয়ন সম্ভব বলে তিনি জানান।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন, চুনতি চাম্বি খাল রাবার ড্যাম প্রকল্প চালু হয়েছে। প্রকল্পের পানি ব্যবহার করে কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন ঘটছে। কিন্তু প্রকল্পের উজানে জমানো পানিতে সৃষ্ট লেক ও আশপাশে কিছু পর্যটন স্পট দর্শনার্থীদের আনন্দে যথেষ্ট নয়। রাবার ড্যাম ও লেকে যাওয়ার রাস্তাটির সংস্কারসহ লেকের পাড়ে আরো সৌন্দর্য বর্ধন এবং রাবার ড্যামের আশপাশের উঁচু-নিচু ছোটো পাহাড়-টিলায় আরো বিভিন্ন আকর্ষণীয় স্পট সৃষ্টি করা হলে এটি দেশের একটি সেরা পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হবে।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

জাতীয় যুব দিবস ২০১৮

যুবদের উন্নয়নে সরকারের সাফল্য

[জানুয়ারি ২০০৯ থেকে জুন ২০১৮]

সুলতানা বেগম

'জেগেছে যুব গড়বে দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'– প্রতিপাদ্য নিয়ে পহেলা নভেম্বর পালন করা হয় 'জাতীয় যুব দিবস ২০১৮'। এ দিবস উপলক্ষে নানা কর্মসূচি পালন করা হয়। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার বৃহৎ অংশই যুব সমাজ। তারাই দেশের মূল চালিকাশক্তি এবং জাতীয় উন্নয়নের ধারক ও বাহক। এদেশের ইতিহাস, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে যুব সমাজের রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। স্বাধীনতা সংগ্রামে যুবদের অসামান্য অবদানের কথা স্মরণ করে সরকার জাতি গঠনে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৮ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সৃষ্টি করা হয়। যা পরবর্তীতে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় হিসেবে পুনঃনামকরণ করা হয়। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর গঠন করা হয়। জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল স্রোতধারায় যুব সমাজকে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে তাদেরকে মানবসম্পদে পরিণত করার মহান ব্রত নিয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। কারণ যুবদের প্রশিক্ষিত ও দক্ষ কর্মীবাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা হলে উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ ত্বরান্বিত হবে। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যুবদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ ঘটিয়ে দেশপ্রেমিক ও আত্মবিশ্বাসী হিসেবেও গড়ে তোলা হচ্ছে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুবদের জন্য দেশব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তিসহ নতুন নতুন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন, তাদের কর্মসংস্থানের সহায়ক হিসেবে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান এবং যুব সংগঠকদের মাধ্যমে সমাজ বিনির্মাণসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। নিম্নে যুব কার্যক্রমের অগ্রগতি ও পদক্ষেপসমূহ উল্লেখ করা হলো–

- যুবদের প্রশিক্ষণ প্রদান: ২৪,০৬,৬৪১ জন
- প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান: ৬,২১,৯১২ জন
- ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণের পরিমাণ: ৮৮৬,৩১.৬৩ লক্ষ টাকা
- ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা: ১,৯৯,৮৮৮ জন
- ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান: ১,৯৩,৯৮৫ জন
- ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় ২ বছরের অস্থায়ী কর্মসংস্থান: ১,৯১,৬৫১ জন
- আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ: ১১টি
- আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অবকাঠামোর ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কার্যক্রম: ২৯টি
- নতুন প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন: ১২টি
- ইন্টারনেট সার্ভিস সুবিধা: ৬৪টি জেলা কার্যালয়, ১০টি
- মেট্রোপলিটন থানা কার্যালয়সহ উপজেলা কার্যালয়: ৪৮৫টি
- নিবন্ধনকৃত যুব সংগঠনের সংখ্যা: ২৭৭১টি
- যুব সংগঠনকে অনুদান প্রদান: ১০৩২.৪০ লক্ষ টাকা
- অনুদানপ্রাপ্ত যুব সংগঠন: ৬০৫০টি
- জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান: ১৪৬ জন
- শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট আইন ২০১৭, যুব সংগঠন নিবন্ধন ও পরিচালনা আইন ২০১৫-এর আলোকে যুব সংগঠন নিবন্ধন ও পরিচালনা বিধিমালা ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে
- যুব কল্যাণ তহবিল আইন ২০১৬ এবং জাতীয় যুবনীতি ২০১৭ প্রণয়ন।

উপরোল্লিখিত তথ্যানুযায়ী যুব কার্যক্রমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভূমিকা ও সাফল্য ব্যাপক। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)-র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) এসডিজি'র কার্যক্রম সমন্বিত করেছে। ফলে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হয়েছে। রূপকল্প-২০২১ এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। জাতীয় যুব দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রতিবছরের ন্যায় এবারো শ্রম, মেধা, সততা, দেশপ্রেম, নৈতিকতা এবং উন্নয়ন ও কর্মপ্রত্যয়ী যুবদের সমাজে অনন্য নজির স্থাপনের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশের সেরা ২৭ জন আত্মকর্মী ও যুব সংগঠক 'জাতীয় যুব পুরস্কার ২০১৮-এ ভূষিত হয়েছে। এরফলে অনুপ্রাণিত হয়ে অপরাপর যুবরা আত্মোন্নয়নের পথে এগিয়ে আসবে। যুব প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে দেশের আপামর জনসাধারণ নিজ নিজ অবস্থান থেকে গৃহীত কর্মসূচিতে সাধ্যমতো অংশগ্রহণ এবং সম্ভাব্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিলে যুবদের সার্বিক উন্নয়ন আরো গতিময় হবে। এছাড়া স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের 'সোনার বাংলা' গড়তে 'জেগেছে যুব গড়বে দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'– প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আমাদের যুব সমাজ দৃঢ় মনোবল ও কর্মপ্রেরণা নিয়ে এগিয়ে আসবে– এ প্রত্যাশা সকলের।

লেখক: প্রাবন্ধিক

আমার কবিতা

দেলওয়ার বিন রশিদ

কিছু কষ্ট বুকের মধ্যে থাকে
কখনো কবিতা হয়ে খাতার পাতায় হয় দৃশ্যমান
এই যে কষ্টের কথা প্রাত্যহিক অস্থিরতা বা
বৈষয়িক টানাপোড়ন সবই
আমার কবিতা,
আমার কবিতা দুঃখের চারা গাছ, বড়ো হয়
পাতা-ফুলে ভরে থাকে।
আমার কবিতা সুবাস ছড়ায় মানবিক গুণের
মানুষ মানবিক গুণ লালন করে শত দুঃখের মধ্যেও
কষ্টের মধ্যেও।

হেমন্তে

আবেদীন জনী

হেমন্তে ওই বইছে হাওয়া
পাকা ধানের গন্ধ নিয়ে
চাষির প্রাণের সুখের গানের
অপূর্ব সুর ছন্দ নিয়ে।
ধান কেটে ওই বাঁধছে আঁটি–
মাথায় নিয়ে ফিরছে বাড়ি
ধুলোমাটির সড়ক দিয়ে
ধান নিয়ে যায় গরুর গাড়ি।
ওই দেখা যায় ধান-কুড়ানির
দল নেমেছে খেতে খেতে
ধান কুড়িয়ে ভরছে ডালা
খুব আনন্দে উঠছে মেতে।
নতুন ধানের খই-মুড়ি আর
পিঠে-পুলির দিন এসেছে
গাঁও-গেরামের খোকাখুকির
খুব খুশিতে প্রাণ ভেসেছে।

অঘ্রাণের ঘ্রাণ

খোরশেদ আলম নয়ন

এখনো হৃদয়ে জমা হয়নি তা আজো ম্রিয়মাণ
সেই শেষ বিকেলের নাড়া পোড়া অঘ্রাণের ঘ্রাণ,
হৃদয়ে গেঁথেছি যার নাম তার সেই ভালোবাসা
কী করে ঢাকবে বলো কার্তিকের নির্দয় কুয়াশা।
অভাবের সংসারে একদিন মিটিয়েছে ক্ষুধা
কী করে ভুলব সেই মনোরম মৃত্তিকার সুধা।
আমন ধানের গন্ধে মুখরিত সেই ঢেঁকিঘর
নাকছাবি পরা সেই চেনা মুখ হয়ে গেছে পর!
মেঘনার ঘোলা জলে সেই যে সে হারালো নিমিষে
কে কোথায় চলে গেল–পাইনি কিছুই তার দিশে!
মানুষের কোলাহল পুষে রেখে বুকে
নদী ও নারীর মতো সুখে আর দুঃখে
বয়ে চলে অবিরাম বুকে নিয়ে বেদনার ঢেউ–
সময়ের স্রোতে শুধু আমরা হারাই; তবু কাছে থাকি কেউ।
ভরা ফসলের মাঠ নিভৃতে গিয়েছে ডুবে আর
কার্তিক-অঘ্রাণ জুড়ে-দেখা নেই তোমার আমার!

শেখ হাসিনার বিশেষ দশটি উদ্যোগের মূলকথা

লিয়াকত আলী চৌধুরী

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নগুলি বাস্তবায়নের তরে,
শেখ হাসিনার হৃদয়ের মাঝে খেলা করে।
সকল বাংলাবাসী অধীর আগ্রহের সাথে,
বিশেষ দশটি উদ্যোগ আসে তাঁর হাতে।
প্রধানমন্ত্রীর দশটি উদ্যোগ অত্যন্ত ভালো,
যেমন চন্দ্র-সূর্য জগতে ছড়ায় আলো।
জগতে বেজে ওঠে দশটি উদ্যোগের গান,
বাঙালিকে দিলেন তিনি উত্তম প্রতিদান।
তাঁরই মুক্তা মনে বাজে বেনু সেই আশা নিয়ে,
বাঙালিরে বাসেন ভালো প্রাণের শান্তি দিয়ে।
পৃথিবীর মানুষ সে মহৎ প্রাণের গান শুনে,
আন্তর্জাতিক পুরস্কার পান দশটি উদ্যোগের গুণে।
নব নব রূপে বাংলায় ভাসে সোনালি আলো,
ধীরে ধীরে পালাচ্ছে বাঙালির জীবনের কালো।
বিশেষ দশটি উদ্যোগ বঙ্গবন্ধুর হৃদয়ে ছিল লেখা,
তার সকল অর্থ প্রাণ তৃপ্তি করে দিল দেখা।
দশটি উদ্যোগ জগতে আলোড়ন করে সৃষ্টি,
শেখ হাসিনার প্রতি রয়েছে প্রভুর দৃষ্টি।

সেই ফুল

আ. আউয়াল রণী

অজস্র ফুলের মাঝে
একটি ফুল,
যার ঘ্রাণ সৌরভ
আর জবানে মধুরিমা বোল।
চাহনির ভাষার গভীরতায়
ক্লিওপেট্রা-মমতাজের কাহিনি।
তার সৌরভ আর রূপের মাঝে
ভাসে লাইলী-মজনু চণ্ডীদাস-রজকিনী।
এ রূপের জগতে
এমন রূপসির আগমন
দৃষ্টিতে পড়েনি
এমন রূপের জাগরণ।
যার রূপের মাঝে
গাঁথন রূপের উর্বরতা।
উত্তাল ঢেউয়ের আলোয়
আঁধার রজনীর কাটায় নীরবতা।
সেই ফুলের
রূপের অহংকার
রূপ পূজারি হয়ে
করব তুলনা নাই যার।
জনম পোহাবে
দেবোত্তর জীবন্ত ধ্যান সাধনায়
এক জনমে ফুরাবে না সাধ
চাইব জনম মিনতি প্রার্থনায়।

আয়কর মেলায় বিপুল সাড়া

ইসরাত জাহান

বাঙালি জাতি চিরদিনই উৎসবমুখী। মেলা, পালাপার্বণ, উৎসব, অনুষ্ঠান ইত্যাদি আমাদের সামাজিক জীবনের অনুষঙ্গ। তাই আয়করের মতো জটিল বিষয়কে নিয়ে মেলার আয়োজন করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনসেবার ক্ষেত্রে নতুন উদাহরণ তৈরি করেছে। উৎসবের মাধ্যমে আয়কর বিষয়ক সকল সেবা জনগণের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। এতে জনগণ যেমন আয়করের জটিলতা কাটিয়ে উঠতে পারছে তেমন দেশও সমৃদ্ধ হচ্ছে। কর আহরণের পাশাপাশি সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা রক্ষা করার লক্ষ্যে আয়কর বিভাগ নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। 'উন্নয়ন ও উত্তরণ, আয়করের অর্জন' স্লোগানকে সামনে রেখে এ বছর আয়কর মেলার প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়– 'আয়কর প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক ন্যায় বিচার ও ধারাবাহিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ'।

সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে একদিকে যেমন পর্যাপ্ত রাজস্ব প্রয়োজন, অপরদিকে ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য হ্রাস করাও জরুরি। রাজস্ব আহরণে আয়কর যেমন জরুরি তেমন বিষয়টি জটিলও। এজন্য আয়কর প্রদান বিষয়ে জনমনে একটি ভীতি কাজ করে। আয়কর ভীতি দূর করা, কর সচেতনতা বৃদ্ধি ও আরো নিবিড় কর সেবা প্রদানের জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আয়কর বিভাগ ২০১০ সালে প্রথমবারের মতো আয়কর মেলা চালু করে। এ মেলার পরিধি এবং মেলার মাধ্যমে আয়কর বিভাগের সেবার পরিসর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৮ সালে দেশব্যাপী সর্বাধিক সংখ্যক ভেন্যুতে আয়কর মেলার আয়োজন করা হয়। ১৩ই নভেম্বর থেকে ১৯শে নভেম্বর চলে এ মেলা। এছাড়া সকল জেলা শহরে ৪ দিন এবং ৩২টি উপজেলায় দুদিন করে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা পর্যায়ে ৭২টি গ্রোথ সেন্টারে একদিন ভ্রাম্যমাণ মেলা হয়। আয়কর মেলায় করদাতা, সম্ভাব্য করদাতা ও ভবিষ্যৎ করদাতাদের জন্য ই-টিন আইএন রেজিস্ট্রেশন করা হয়। পাশাপাশি রিটার্ন গ্রহণ, কর পরিশোধ ও কর বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আয়কর কী, কেন দিতে হয়– এ সম্পর্কে অনেক মানুষেরই কোনো ধারণা নেই। আয়কর দেওয়া যে মোটেও ভয়ের কোনো ব্যাপার নয়, দেশের সমৃদ্ধির জন্য আয়কর যে অতি গুরুত্বপূর্ণ এ বার্তা জনগণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করছে এ মেলা।

এক নজরে নয় বছরের আয়কর মেলার সাফল্য

আয়কর মেলা	মেলার স্পট সংখ্যা	নতুন টিন ই-টিন ইস্যু	আয়কর রিটার্ন দাখিল	আয়কর আদায় (কোটি টাকায়)	সেবা গ্রহণকারীর (সংখ্যা)
আয়কর মেলা-২০১০	২	৫,৬৩৮	৫২,৫৪৪	১১৩	৬০,৫১২
আয়কর মেলা-২০১১	৮	১০,০৪১	৬২,২৭২	৪১৪	৭৫,১২০
আয়কর মেলা-২০১২	১৮	১৬,২৮৭	৯৭,৮৬৭	৮৩১	৩৪৬,৮৬৭
আয়কর মেলা-২০১৩	৬৪	৮৬,৬৯৩	১,৩২,০১৭	১,১১৭	৫১০,১৪৫
আয়কর মেলা-২০১৪	৬৪	২৬,৭৪৫	১,৪৯,৩০৯	১,৬৭৫	৬,৪৯,১৮৫
আয়কর মেলা-২০১৫	৬৪	১৫,২০০	১,৬১,০৬০	২০৩৫.৩৫	৭৫৭৭৫৪
আয়কর মেলা-২০১৬	১৫০	৩৬৮৫৩	১,৯৪,৫৯৮	২১২৯.৬৭	৯,২৮,৯৭৩
আয়কর মেলা-২০১৭	১৬৭	২৯,২৫৪	৩,৩৫,৪৮৭	২২১৭.৩৩	১১,৬৯,৫৬৯
আয়কর মেলা-২০১৮	১৬৬	৩৯,৭৪৩	৪,৮৭,৫৭৩	২৪৬৮.৯৪	১৬,৩৬,২৬৬

বিগত কয়েক বছরে বেশকিছু উদ্যোগের কারণে করদাতাদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে। ভয়ভীতি দূর হয়েছে। এখন অনেকেই স্বপ্রণোদিত হয়ে কর প্রদানে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। করদাতাদের সামাজিক মর্যাদা বাড়ানো হয়েছে। তাদের পুরস্কৃত করা হচ্ছে। এ কারণে কর প্রদানে সক্ষম ব্যক্তিরা কর প্রদানে এগিয়ে আসছেন। ফলে আয়কর দাতার সংখ্যাও বেড়েছে। এবারের মেলা প্রাঙ্গণে করদাতাদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ করা গেছে।

মেলার উদ্‌বোধন করে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, ১৬ কোটি মানুষের মধ্যে ১ কোটি করদাতা। দেশে করযোগ্য আরো তিন কোটি মানুষ আছে বলে জানান। বর্তমানে সারাদেশে আয়কর শনাক্তকারী নম্বর বা টি-আইএন ধারীর সংখ্যা ২০ লাখ। আগামী দুই বছরে এই সংখ্যা বাড়িয়ে ৩৫ লাখ করা এবং ই-টিআইএন ধারীর সংখ্যা ৫০ লাখে উন্নীত করার লক্ষ্য ঠিক করেছে এনবিআর।

লেখক: প্রাবন্ধিক

নিবন্ধ

এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

রোজি আক্তার

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কিছু সমালোচক বলেছিল, তলাবিহীন ঝুড়ি, এর অর্থনীতি অত্যন্ত ভঙ্গুর– এটা টেকে কি টেকে না, তাই সন্দেহ। কিন্তু সেই বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। সেই বাংলাদেশ আজ বিশ্বসভায় উন্নয়নের 'রোল মডেল' হিসেবে স্বীকৃত। এটা সম্ভব হয়েছে কোনো আলাদিনের প্রদীপের জোরে নয়, এটা হয়েছে এদেশের মানুষের শ্রম আর মেধার গুণে। দেশের প্রতিটি সেক্টরে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে– সেটা হোক গ্রাম কি শহর। দারিদ্র্যসীমার নিচে যারা ছিল তারা ক্রমশ সে সীমার উপরে উঠে এসেছে। গ্রামের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সুবিধা পৌঁছে গেছে। ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েরা সাইকেলে চড়ে স্কুলে যাচ্ছে, খেলাধুলা করছে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে। এসবই সম্ভব হচ্ছে দূরদর্শী প্রশাসকের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির কারণে।

সফলতার সেসব ধাপের কিছু এখানে তুলে ধরা হলো– সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ বেশ সফলতার পরিচয় দিয়েছে। নির্ধারিত সময়সীমার আগেই অনেকক্ষেত্রে সাফল্য দেখিয়েছে। চরম দারিদ্র্যের হ্রাস ২০১৫ সালের আগেই অর্থাৎ ২০১০ সালেই অর্ধেকের বেশি নিচে নামিয়ে এনেছে। ১৯৯১ সালের ৪১ শতাংশ থেকে ২০১০ সালে ১৩ শতাংশে নেমে আসে। ২০১০ ও ২০১৮ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার ৩১ শতাংশ থেকে ২২ শতাংশে নেমে এসেছে। বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ু যেখানে ৭৩ বছর, ভারতের সেখানে ৬৯ বছর, পাকিস্তানের ৬৭ বছর। শিশুমৃত্যুর হার বাংলাদেশে যেখানে প্রতি হাজারে ২৮, ভারতে ৩৫, পাকিস্তানে ৬৪। মাতৃমৃত্যুর হারের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের অর্জন ভারত, পাকিস্তানের চেয়ে ভালো। বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যু প্রতি হাজারে ১৭৬ জন, উন্নয়নশীল দেশে তা ২৩২। বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার হার ৭৩ শতাংশ, ভারতে ৬৯, পাকিস্তানে ৫৭ শতাংশ। যুব সাক্ষরতার ক্ষেত্রেও একই চিত্র। প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ এগিয়ে আছে। নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য বিলোপের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ অনেকখানি অগ্রগামী। সাক্ষরতার হার তরুণদের মধ্যে যেখানে ৯০ শতাংশ, তরুণীদের মধ্যে তা ৯৩ শতাংশ। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে অন্তর্ভুক্তির হারেও মেয়েরা এগিয়ে। উপরে উল্লিখিত উপাত্ত চিত্রে থেকে দেখা যায়, বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে যত দক্ষভাবে সামাজিক অগ্রগতির দিকে নিয়ে গেছে বিশ্বের অনেক দেশ তা পারেনি।

১৯৭১ সাল থেকে মাত্র ৪৫ বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ২৫ বছর বেড়েছে। বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১৯৮১ সালে বাংলাদেশে নারীদের গড় আয়ু ছিল ৫৫.৩ বছর, পুরুষের ৫৪.৫ বছর। ২০১৭ সালে এসে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে নারীর ৭৩.৫ আর পুরুষের ৭০.৬ বছর। অর্থাৎ গত ৩৭ বছরে মানুষের গড় আয়ু ১৫-১৯ বছর বেড়েছে। গড় আয়ু বৃদ্ধির পেছনে একটা বড়ো ভূমিকা রেখেছে নবজাতক মৃত্যুর হার হ্রাস। একটা দেশের স্বাস্থ্যসেবার অবস্থা কেমন সেটি নবজাতক মৃত্যুর হার থেকে অনুমান করা যায়।

দেশে এখন স্বাস্থ্যসেবা নেওয়ার সুযোগ বেড়েছে ব্যাপকভাবে। সহজে পৌঁছানো যায় না এবং কাছাকাছি স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থা নেই এমন জায়গা দেশে এখন কম। স্বাস্থ্য খাতে অগ্রগতির যে কারণগুলো রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো টিকাদান কর্মসূচির অতুলনীয় সাফল্য। টিকাদানের ক্ষেত্রে ১২-১৩ মাস বয়সি শিশুদের হামের টিকা গ্রহণের হার ৯৪ শতাংশ আর ১২-২৩ মাস বয়সি শিশুদের ডিপিটি টিকা গ্রহণের হার ৯৭ শতাংশ, বিসিজি (যক্ষ্মা) টিকা দেওয়ার হার ৯৯ শতাংশ। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় অনেক এগিয়ে। সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)-এর মাধ্যমে সারাদেশে বিনামূল্যে শিশুদের এ টিকাগুলো দেওয়া হয়। প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট দিনে ছয় লাখ স্বেচ্ছাসেবক সারাদেশের প্রায় ৯০ শতাংশ শিশুকে পোলিও টিকা, ভিটামিন এ ক্যাপসুল ও কৃমি নাশক ওষুধ খাওয়ায়। বাংলাদেশের ইপিআই কার্যক্রম বিশ্বে অনুকরণীয় একটি দৃষ্টান্ত। পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুর মৃত্যু হারের (প্রতি হাজারে) দিক থেকেও বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় সাফল্য পেয়েছে।

সত্তরের দশকে গ্রামাঞ্চলে স্যানিটেশনের হার ছিল ১ শতাংশের নিচে। ১৯৮১ সালে এ হার ছিল ০১ শতাংশ আর শহরাঞ্চলে ২২ শতাংশ। ২০১৫ সালে এ হার এসে দাঁড়িয়েছে শতভাগ। যা সারাবিশ্বের কাছে রীতিমতো বিস্ময়কর। বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির হিসাবে দেশের চাহিদার ৯৭ শতাংশ ওষুধ এখন দেশেই তৈরি হয়। এর মধ্যে ৯০ শতাংশ ওষুধ উৎপাদন করে দেশি কোম্পানিগুলো। বাংলাদেশ এখন আমেরিকা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ওষুধ রপ্তানি করছে। ১৯৮২ সালে যেখানে ১৬ শতাংশ ওষুধ দেশে তৈরি হতো, ৮৪ শতাংশ ওষুধ আমদানি করতে হতো।

সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক সব ক্ষেত্রেই নারীর অগ্রযাত্রা এখন চোখে পড়ার মতো। কোথায় নেই নারী– শিক্ষকতা, চিকিৎসা, শান্তিরক্ষী মিশন, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, পুলিশ, গাড়ি চালনা চা-শিল্প, পোশাক শিল্প, চামড়া শিল্প, ওষুধ শিল্প, কৃষিক্ষেত্র, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্রিকেট, ফুটবল, কারাতে, কাবাডি, ভারোত্তোলন, হিমালয়ে, সচিব, মন্ত্রী, এমপিসহ প্রশাসনের উচ্চ পর্যায় থেকে আন্তর্জাতিক অঙ্গন সব জায়গা এখন নারীর পদচারণায় মুখরিত। প্রাথমিকে ছেলে-মেয়ে সমতা অর্জিত হয়েছে, মাধ্যমিকেও মেয়েরা এগিয়ে গেছে, সাক্ষরতার হারেও এগিয়ে মেয়েরা। নারী শিক্ষকের হারও বেড়েছে বহুগুণ। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সবচেয়ে বড়ো মাধ্যম তৈরি পোশাক শিল্প। সেখানেও নারীর অবদান পুরোভাগ জুড়ে। বিশ্বে যে কৃষিকাজের সূচনা হয়েছে তাও নারীর হাত ধরে, সে কৃষি ক্ষেত্রে সাফল্যের পেছনেও রয়েছে নারী। দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধীদলীয় নেত্রী, স্পিকার নারী। তৃণমূল পর্যায়ে অর্থাৎ স্থানীয় সরকার নির্বাচনেও নারীরা সমানতালে অংশ নিচ্ছেন। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় পুরুষের পাশাপাশি দেশকে এগিয়ে নিতে নারীও সমান অংশীদার। নারী শুধু আজ বধূ, মাতা, কন্যা নয় তারা পরিবার, সমাজ ও দেশ গঠনের কারিগর।

নব্বইয়ের দশক থেকে জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধির হারের বিচারে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান একেবারে প্রথম সারিতে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বের ৪৩তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। মাথাপিছু আয় ২০০৬ সালের ৫৪৩ মার্কিন ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮ সালে ১ হাজার ৭৫১ মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে। জিডিপি প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে গত অর্থবছরে শতকরা ৭.৮৬ ভাগ। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রপ্তানি আয় বৃদ্ধি ও বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরতা কমানোর ক্ষেত্রেও চমকপ্রদ সাফল্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ। এসব কারণে ভিন্ন অর্থে হলেও বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের নতুন পরীক্ষাগার হতে যাচ্ছে, যা অন্যান্য দেশের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

জাতীয় সমবায় দিবস

সমবায় হোক টেকসই উন্নয়নের রূপকার

ড. এজাজ মামুন

'সমবায়ভিত্তিক সমাজ গড়ি, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করি'– প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এবার দেশে দিবসটি উদযাপিত হচ্ছে।

বাংলাদেশের পল্লি অঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচন, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নারীর ক্ষমতায়নে সমবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বর্তমান বাংলাদেশে ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৭০০টি সমবায় সমিতিতে ১ কোটিরও অধিক সমবায়ী বহুমুখী আর্থিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। তাদের কার্যকরী মূলধন প্রায় ১৩ হাজার ৫৮০ কোটি টাকা, যা জাতীয় অর্থনীতিতে দৃশ্যমান ভূমিকা রেখে চলেছে। এ বিপুল জনগোষ্ঠীকে পরিকল্পিত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তুলে উৎপাদন ও বাজারমুখী সমবায়ের আওতায় এনে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব। মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রসার, উন্মুক্ত বাজার ব্যবস্থা, তথ্যপ্রযুক্তির বিপ্লব আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করছে।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ২৫শে নভেম্বর ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবস ২০১৮ উদ্‌যাপন এবং জাতীয় সমবায় পুরস্কার ২০১৬ ও ২০১৭ বিতরণ অনুষ্ঠানে পদকপ্রাপ্তদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা–পিআইডি

কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং উৎপাদনমুখী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে 'উন্নত জাতের গাভী পালনের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত মহিলাদের জীবনযাত্রার উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটি অন্যতম। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ১৫১৫৬.০৩ লক্ষ টাকা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচিত্রমুখী সফল নেতৃত্ব ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, শ্রেণি নির্বিশেষে সকল হীনতা, নীচতা, অন্যায় অনাচার ও সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে। তাই সমাজের সুবিধা বঞ্চিত জনগণের উন্নয়নের লক্ষ্য তাঁর স্বপ্নপ্রসূত 'একটি বাড়ি, একটি খামার' প্রকল্পের আওতায় সমবায়ের মাধ্যমে 'ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন'-এর লক্ষ্যে ৩৯৮৩.০৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প সমবায় অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন আছে।

সমবায় মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্যে জানা গেছে, বিগত বছরগুলোতে সমবায়ের মাধ্যমে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে সরকার। আরো দুটি দুগ্ধভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। পাশাপাশি কৃষি ও অকৃষি পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের জন্য কাজ করে যাচ্ছে সরকার। এছাড়াও সমবায়ভিত্তিক 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এখন থেকে আর মাইক্রোক্রেডিট নয়, 'মাইক্রো সেভিংস'-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। গড়ে তোলা হয়েছে পল্লি সঞ্চয় ব্যাংক।

সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহ টেকসই উন্নয়ন অর্জনে সক্ষম। টেকসই উন্নয়ন বলতে কী বুঝায়? ১৯৮৭ সালে টেকসই উন্নয়নের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয় তাতে উল্লেখ করা হয়, 'ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিজস্ব চাহিদা পূরণের দক্ষতায় আপোশ না করে যে উন্নয়ন বর্তমানের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম তা-ই হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন'।

ইংরেজিতে বলা হয়েছে, ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরিওতে ২০১২ সালের জুন মাসে ১৯২ দেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে রিও+২০ ঘোষণা গৃহীত হয়। যাতে বলা হয়, টেকসই অর্থনীতি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে প্রত্যেক দেশ সবুজ অর্থনীতি অর্জন করবে এবং প্রত্যেক দেশ সবুজ অর্থনীতি অর্জন করবে তবে তিনটি মৌলিক বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করতে হবে, তা হচ্ছে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশ সংরক্ষণ। জাতিসংঘের অধিবেশনে রিও+২০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৩০ সদস্যের ওপেন ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয় যারা (Sustainable Development Goals-Post 2015) এর বিভিন্ন বিষয় ও প্রাধিকারসমূহ চিহ্নিত করেছে। টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য হিসেবে প্রাথমিকভাবে প্রায় ১২টি এজেন্ডা চিহ্নিত করেছে। লক্ষ্যগুলো হলো–

১. দারিদ্র্য বিমোচন ২. মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ সমতা ৩. গুণগত শিক্ষা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষা ৪. স্বাস্থ্য সুরক্ষা ৫. খাদ্য-নিরাপত্তা ও উত্তম পুষ্টি ৬. সর্বজনীন পানি প্রাপ্তি ও পরিচ্ছন্নতার সুযোগ ৭. স্থিতিশীল বিদ্যুৎপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা ৮. কর্মের সুযোগ, জীবিকার নিশ্চয়তা এবং সমদর্শী উন্নয়ন ৯. প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবস্থাপনা ১০. সুশাসন এবং দক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ১১. স্থিতিশীল এবং শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠা ১২. বিশ্বজনীন ভালো পরিবেশ ও দীর্ঘমেয়াদি আর্থিক উন্নয়ন।

গণমুখী অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন, দারিদ্র্য বিমোচন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশের বিপর্যয় প্রতিরোধ এবং খাদ্য নিরাপত্তার বলয় সৃষ্টিতে অন্যতম ও উৎকৃষ্ট পদ্ধতি হচ্ছে সমবায়ী উদ্যোগ। তাই সমবায়ী চেতনায় দিতে হবে নতুন উদ্দীপনা, সকল সহযোগিতা, আইন ও বিধিমালা সহজ করে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে দ্রুত সিদ্ধান্ত

নেওয়ার সুযোগ। যেমনটি লক্ষ করা যায় জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইডেন, নিউজিল্যান্ড অথবা অস্ট্রেলিয়ার মতো উন্নত বিশ্বে। এ সকল দেশে সমবায় অঙ্গনে বৃহৎ পুঁজির অনুপ্রবেশের ফলে সমবায় সমিতিসমূহ অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলে এবং বিশ্ববাজারে বিশেষ স্থান করে নিয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, পরিবেশের বিপর্যয় প্রতিরোধ এবং খাদ্য-নিরাপত্তা বলয় সৃষ্টিতে অন্যতম উৎকৃষ্ট পদ্ধতি সমবায়ী উদ্যোগ। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বের প্রায় ৩০০ কোটি মানুষ সমবায়ের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। বিশ্বের ৩০০টি সমবায় প্রতিষ্ঠানের সম্পদের পরিমাণ ৩০-৪০ হাজার কোটি মার্কিন ডলার। আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রীর হিসাব অনুসারে, কানাডা, জাপান ও নরওয়েতে প্রতি ৩ জনে ১ জন সমবায়ী। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিতে প্রতি ৪ জনে একজন সরাসরি সমবায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। গণচীনে ১৮০ মিলিয়ন, ভারতে ২৩৬ মিলিয়ন, মালয়েশিয়ায় ৫.৪ মিলিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৯.৮ মিলিয়ন জনগণ সমবায়ের সদস্য। জাপানে কৃষিকাজে নিয়োজিতদের ৯০ শতাংশ সমবায়ী।

বেলজিয়ামে সমবায়ের মালিকানায় পরিচালিত ঔষধ শিল্প বাজারে ১৯.৫% শেয়ার অধিকার করে আছে। ব্রাজিলে সমবায় সমিতিসমূহ কৃষিতে ৪০% এবং কৃষিজাত পণ্য রপ্তানিতে ৬% অবদান রাখছে। কানাডার সমবায় সমিতিসমূহ বিশ্বের ৩৫% ম্যাপেল সুপার উৎপাদন করে। কেনিয়ায় ৪৫% দেশজ উৎপাদন এবং ৩১% জাতীয় সঞ্চয় সমবায় সমিতিসমূহ থেকে আসে। তেমনিভাবে কোরিয়ার প্রায় ৯০% খামার-চাষি কৃষি সমবায়ের সদস্য এবং প্রায় ৭১% মাছের বাজার মৎস্য খাতের সমবায়ীরা নিয়ন্ত্রণ করে। ডেনমার্ক ও নরওয়ের ৯৫% দুধ উৎপাদন ও বাজারজাত করে সমবায়ীরা।

বাংলাদেশে প্রধানত ২৯ ধরনের সমবায় সমিতি আছে– যার মধ্যে কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন, গৃহায়ন, পরিবহণ, দুগ্ধ উৎপাদন, ঋণ ও সঞ্চয় এবং ক্ষুদ্র ঋণদান কর্মসূচি পরিচালনা উল্লেখযোগ্য। এ সকল সমিতির মধ্যে প্রায় ৫০ শতাংশ কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন ও বিতরণের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্ভাসিত বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত্তি হচ্ছে 'দেশের মাটি থেকে উত্থিত উন্নয়ন দর্শন' (Home grown development philosophy)। এ আদর্শ অনুসরণ করে অগ্রগতির পথে ধাবিত হচ্ছে দেশ। দেশের লক্ষ্য হচ্ছে সবার জন্য সমান অর্থনৈতিক সুযোগ, সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, কর্ম সম্পাদনে স্বচ্ছতার নিশ্চয়তা ও সকল স্তরে সুরক্ষা বিধান।

টেকসই উন্নয়নের রূপকার হিসেবে সমবায়কে প্রতিষ্ঠিত ও উজ্জীবিত করতে হলে নিম্নোক্ত কয়েকটি পদক্ষেপ অত্যন্ত জরুরি বলে প্রতীয়মান হয়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে–

❑ সমবায়ী চেতনা বিকাশের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় বাজেটে সমবায় খাতের জন্য অর্থের সংস্থান থাকতে হবে। বাজেটে সমবায়ের চেতনা বিকাশে বক্তব্য থাকতে হবে এবং অর্থায়ন করতে হবে। সরকারের আর্থিক সংশ্লেষ থাকলে তদারকির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

❑ সমবায় খাতে 'সুশাসন' প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে সমবায়ের ভাবমূর্তি বিকশিত হবে না এবং জনগণের আস্থা অর্জন ও সহযোগিতা লাভ অসম্ভব হবে। সমবায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের জন্য প্রযোজ্য আচরণবিধি এবং শৃঙ্খলা ও আপিল বিধিমালা কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

❑ সমবায়ের সকল কর্মকাণ্ড ডিজিটাইজড করতে হবে এবং হিসাব-নিকাশ নিরীক্ষার সুবিধার্থে একক সফটওয়্যার ব্যবহার করতে হবে।

❑ 'গবেষণা ও প্রচারণা' নামে একজন অতিরিক্ত নিবন্ধকের অধীনে পৃথক বিভাগ খুলতে হবে। তিনিই নিয়মিত ত্রৈমাসিক মনিটরিং-এর আয়োজন করবেন।

❑ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায়ের ব্যাপক ভূমিকা সম্পর্কে জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করতে হবে।

সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে সমবায়ের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অর্জন সম্ভব, এ বার্তা সুপ্রতিষ্ঠিত করাই হচ্ছে সমবায় অধিদপ্তরের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ এবং আন্তর্জাতিক সমবায় দিবসের অন্যতম আবেদন।

সমবায়ই হতে পারে কৃষকের জীবনমান উন্নয়নের চাবিকাঠি

কৃষি যে বাংলাদেশের প্রাণ এ কথাটা প্রমাণ করবার জন্য তথ্য-উপাত্তের তেমন প্রয়োজন নেই। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে বিধ্বস্ত বাংলাদেশের শূন্য উদ্যানকে এদেশের কৃষক এবং কৃষি কর্মীরাই এখন উদ্বৃত্ত খাদ্য উৎপাদনের দেশে পরিণত করেছেন। কৃষিই দেশের তিন-চতুর্থাংশ মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে। তাই দেশের সার্বিক আর্থসামাজিক উন্নতি কোনোভাবেই কৃষির উন্নয়ন ও কৃষকের আয়ের পথকে সুগম করা ছাড়া সম্ভব নয়।

বঙ্গবন্ধু কৃষি সমবায়কে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতেন বলেই ১৯৭৩ বাংলাদেশ দুগ্ধ উৎপাদনকারী সমবায় ইউনিয়ন লিমিটেড (মিল্কভিটা নামে পরিচিত) গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বাংলাদেশের মতো দেশে যেখানে ক্ষুদ্র কিংবা প্রান্তিক চাষির সংখ্যাই বেশি সেখানে সমবায় হতে পারে উন্নত কৃষি ব্যবস্থার চালিকাশক্তি। কৃষকের পণ্যের উৎপাদন, উন্নত প্রযুক্তির জোগান ও সমন্বয়, সম্প্রসারণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, বাজারজাত, বিপণন ও প্রয়োজনে ঋণ– সবকিছুই হতে পারে কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে। এর মাধ্যমে কৃষক যেমন সহজে তাঁর পণ্য উৎপাদনে যথাযথ ব্যবস্থা করতে পারবেন তেমনি মধ্যস্বত্বভোগীদের যেমন ফড়িয়া, পাইকার, দালালের অযাচিত যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে সরাসরি ক্রেতার সাথে যোগাযোগের সহজ পথ পাবেন। ফলে তাঁদের ফসল থেকে মুনাফা অর্জনও বেড়ে যাবে। আমাদের দেশের সতেজ ও প্রক্রিয়াজাতকৃত ফলের বিদেশের বাজারে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে, যা বয়ে আনবে আমাদের জন্য অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। মৎস্য শিল্পের ক্ষেত্রেও এমনটি সম্ভব। সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সমবায়ের মাধ্যমে খুব সহজেই গড়ে তোলা সম্ভব সংরক্ষণ, রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণন কেন্দ্র।

আমরা দৃঢ় প্রত্যয়ে বিশ্বাস করি, বঙ্গবন্ধুর কাঙ্ক্ষিত বহুমুখী গ্রাম সমবায় ও কৃষি সমবায় কর্মসূচি এখনো বাংলাদেশের সিংহভাগ মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়ন তথা ভাগ্য উন্নয়নের চাবিকাঠি। বর্তমান কৃষিবান্ধব সরকার আগামী দিনের সুখী সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গঠনে ও কৃষকের জীবনমান উন্নয়নের জন্য কৃষি সমবায়ের বিষয়টিকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন এই আমাদের প্রত্যাশা ।

লেখক: সাংবাদিক

হাসিনা: অ্যা ডটার'স টেল

নাফেয়ালা নাসরিন

সম্প্রতি মুক্তিপ্রাপ্ত *হাসিনা: অ্যা ডটার'স টেল* ডকুড্রামাটি মিডিয়া জগতে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জীবনী নিয়ে নির্মিত 'হাসিনা: অ্যা ডটার'স টেল' ১৬ই নভেম্বর দেশের চারটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায়। পরবর্তীতে দেশের অধিকাংশ প্রেক্ষাগৃহে সফলভাবে প্রদর্শিত হচ্ছে। চলচ্চিত্রটির ব্যাপ্তিকাল: ৭০ মিনিট। এর আগে সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় মুক্তি প্রতীক্ষিত *হাসিনা: অ্যা ডটার'স টেল* ছবিটির। দুই মিনিট ৪৮ সেকেন্ডের ট্রেলারটি চলচ্চিত্র বোদ্ধা থেকে শুরু করে মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, রাজনীতিবিদরাও তাদের টুইটার, ফেসবুক এবং ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করেন। ২৮শে সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে নিজের ফেসবুক পেজে ট্রেলারটি প্রকাশ করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক। প্রধানমন্ত্রী পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয় ফেসবুক ভেরিফায়েড পেজে ট্রেলারটি সর্বপ্রথম প্রকাশ করেন। *হাসিনা: অ্যা ডটার'স টেল* ছবিটি যৌথভাবে প্রযোজনা করেছে আওয়ামী লীগের গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশন (সিআরআই)। চলচ্চিত্রটির প্রযোজক সাব্বির বিন শামস, নির্মাতা পিপলু খান। সিনেমাটোগ্রাফার সাদিক আহমেদ, সম্পাদনা করেছেন নবনীতা সেন আর সংগীতে আছেন দেবজ্যোতি মিশ্র। সিআরআই-এর ব্যানারে প্রামাণ্যচিত্রটির প্রযোজক হিসেবে আছেন রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ও নসরুল হামিদ বিপু।

কৃষিবিদ ইনস্টিটিউটের কনভেশন হলে ১৩ই নভেম্বর ২০১৮ সংবাদ সম্মেলনে ৪ প্রেক্ষাগৃহে হাসিনা: অ্যা ডটার'স টেল-এর মুক্তির তথ্য জানানো হয়

১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর মধুমতি নদীর অনতিদূরে টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি, সোনার বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বড়ো সন্তান তিনি। সেজন্যই পিতার কাছাকাছি আসার সুযোগ ঘটেছিল অন্যান্য সন্তানদের তুলনায় বেশি। পিতার আদর্শের প্রতিফলন আমরা তাঁর মাঝে খুঁজে পাই। সততা, দৃঢ়তা, ন্যায়নিষ্ঠা, সাহসিকতা, দূরদর্শিতা, অসীম ধৈর্য, মানুষের প্রতি মমত্ববোধ সবই তার মধ্যে দৃশ্যমান। তাঁর গতিশীল নেতৃত্ব এদেশকে উন্নয়নের মহাসোপানে পৌঁছে দিয়েছে। ইতোমধ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজের বিচক্ষণতা আর দূরদর্শিতা দিয়ে নিজেকে শুধু দক্ষিণ এশিয়ারই নয় বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর ও জনপ্রিয় নেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। আঞ্চলিক রাজনীতির বাইরেও তিনি এখন আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। মানবিকতার নজিরে বিশ্ব মানবতার মা তিনি। তবে হঠাৎ করে তিনি রাষ্ট্রনায়ক বনে যাননি, তাঁর উত্থান একদিনেই হয়নি, তাঁকে অনেক চড়াই-উতরাই পেরোতে হয়েছে।

১৯৭৫ পরবর্তী সময়ে তাঁকে অসহনীয় কষ্ট, মর্মবেদনার মধ্য দিয়ে ৬ বছর পার করতে হয়েছিল। যে দলের নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়েছে সেই আওয়ামী লীগের কর্মকাণ্ড সেই সময়ে নিষিদ্ধ হওয়ায় দলটি অনেকটা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। ১৯৮১ সালে আওয়ামী লীগের সম্মেলনে শেখ হাসিনাকে দলের সভাপতি নির্বাচিত করার পর ছয় বছর নির্বাসিত জীবন শেষে ১৯৮১ সালের ১৭ই মে বৃষ্টিস্নাত বিকেলে সব হারানো বঙ্গবন্ধু কন্যা দেশে ফিরে আসেন। দলটি পুনঃগঠিত হয়। তাঁর একাগ্রতা, নিরলস পরিশ্রম, আত্মপ্রত্যয়, দূরদর্শী নেতৃত্বে ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করে অন্য কয়েকটি দলের সমন্বয়ে মহাজোট সরকার গঠন করেছিলেন। সেই থেকে বঙ্গবন্ধু-কন্যার নতুন পথ চলা শুরু। আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা, বিরোধীদলীয় নেতা শেখ হাসিনা, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা– এই তিন পরিচয়ে পরিচিত শেখ হাসিনা। তাঁকে নতুন করে চিনিয়ে দেবার কিছু নেই। কিন্তু রাষ্ট্রনায়ক আর রাজনৈতিক পরিচয়ের অন্তরালে থাকা শেখ হাসিনার গল্প অনেকটাই অজানা। এক রাতেই বাবা, মা, ভাইদের হারিয়ে নির্বাসিত জীবনে বুকের গভীরে কষ্ট চেপে তিনি আবার কীভাবে ঘুরে দাঁড়ালেন; তাঁর সেই সংগ্রামের অজানা কথাগুলোই *হাসিনা: অ্যা ডটার'স টেল* প্রামাণ্যচিত্রটির উপজীব্য বিষয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে গ্লোরিফাই করতে নয়; কোনো রাজনৈতিক বিষয়কে বিবেচনায় নিয়েও নয়, বরং একটি দেশের ইতিহাসের একটি সময়কে ৭০ মিনিটে তুলে আনবার একটি প্রয়াস যেন লক্ষ করা যায় প্রামাণ্যচিত্রটিতে।

ছবিটির সুটিং হয়েছে গণভবন, টুঙ্গিপাড়া ও ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়িতে। দেশের বাইরে জার্মানি, ভারত, ব্রাসেলস ও প্রাগে ছবিটির সুটিং করা হয়েছে। বস্তুত তাঁর জীবন যেখানে যেভাবে মোড় নিয়েছে সবটাই তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে ছবিটিতে। এটি নির্মাণ করতে পরিচালক প্রায় পাঁচ বছর সময় নিয়েছেন। দুই বছরের গবেষণা ও তিন বছরের নিরলস প্রচেষ্টায় নির্মিত হয়েছে এই ডকুড্রামা। এতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জীবনের দুঃখ-বিষাদ, ব্যক্তিগত আখ্যান আর নৈকট্যের গল্প প্রকাশিত হয়েছে নিজস্ব স্বকীয়তায়।

বাবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তাঁর সম্পর্ক, তাঁর সংস্পর্শে বেড়ে ওঠা, বাবার রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি তাঁর অবিচল আস্থা ও বিশ্বাসের প্রতিফলনও আমরা খুঁজে পাই। তাঁর বোন (বঙ্গবন্ধুর আরেক কন্যা) শেখ রেহানার কথাও এখানে খুব স্বাভাবিকভাবে চলে এসেছে। কারণ তাঁরা দুই বোন হরিহর আত্মা, পরস্পরের জীবনের খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ডকুড্রামাটির গল্পটি সিনেমাটিক ছিল না। একটা গল্পের সাথে আরেকটার সংযোগ রাখতে ভিন্ন আঙ্গিকে চেষ্টা করা হয়েছে। শেখ রেহানার বর্ণনা দিয়ে ছবিটি শুরু হয়েছে। তারপর এগিয়েছে নিজস্ব ছন্দে। বিভিন্ন স্থান-কালে দর্শকদের ঘুরিয়ে আনার মধ্য দিয়ে সিনেমাটির গল্প আবর্তিত হয়েছে।

লেখক: সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস

প্রয়োজন গণসচেতনতা

কে সি বি তপু

ডায়াবেটিস একটি মহামারি ও জীবনব্যাপী রোগ। তবে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে থাকলে স্বাভাবিক জীবনযাপন করা যায়। অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের জটিলতা অনেক। ডায়াবেটিস রোগের লক্ষণ, চিকিৎসা সর্বোপরি নিয়ন্ত্রণে রাখার কৌশল সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ১৯৯১ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশ্ব ডায়াবেটিস ফেডারেশন (আইডিএফ) ১৪ই নভেম্বরকে ডায়াবেটিস দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। সেই থেকে ১৪ই নভেম্বর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হলো ডায়াবেটিস সম্পর্কে সচেতনতা বিষয়ে বৈশ্বিক প্রচারণার মাধ্যমে রোগটি নিয়ন্ত্রণে রাখা। খ্যাতনামা কানাডীয় চিকিৎসক ও চিকিৎসাবিজ্ঞানী ফ্রেডরিক বেন্টিং (১৪ই নভেম্বর-২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৪১) তার সহযোগী বিজ্ঞানী চার্লস বেল্টকে নিয়ে অধ্যাপক ম্যাকয়িডের গবেষণাগারে ১৯২২ সালে ডায়াবেটিস রোগ নিয়ন্ত্রণের মহৌষধ 'ইনসুলিন' আবিষ্কার করেন। তাঁর আবিষ্কারের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৪ই নভেম্বর (বেন্টিং-এর জন্মদিন) বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস হিসেবে নির্ধারণ হয়। তিনি ১৯২৩ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

বিশ্ব ডায়াবেটিস ফেডারেশনের (আইডিএফ) ২০১৫ সালে প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী ডায়াবেটিসের কারণে বিশ্বে প্রতি সেকেন্ডে একজন মৃত্যুবরণ করছে। প্রতি ১২ জনে একজন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। বিশ্বে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা সাড়ে ৪১ কোটির মতো। ২০১৫ সালে প্রকাশিত উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশে ৭১ লাখ লোক ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। আরো ৭১ লাখ লোক শনাক্তের বাইরে। সে হিসাবে ধারণা করা হচ্ছে, সেই সময়ে বাংলাদেশে ১ কোটি ৪২ লাখ লোক ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। দেশে বাড়ছে গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও। বাংলাদেশে গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের হার অন্যান্য দেশের তুলনামূলক বেশি। প্রতিবছরে বাড়ছে আরো ১ লাখ রোগী। সব বয়সের লোক ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হচ্ছে। দিন দিন বাড়ছে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা। বর্তমানে সারা বিশ্বে ডায়াবেটিস রোগীর সংখ্যা বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান দশমে।

বাংলাদেশসহ সারাবিশ্বে ডায়াবেটিস মহামারি হয়ে উঠেছে। একটি আতঙ্কের নাম হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছে। ডায়াবেটিস প্রতিরোধে এখনই কার্যকর উদ্যোগ না নিলে বিশ্বে ডায়াবেটিক রোগীর সংখ্যা আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে ৬৪ কোটি ছাড়িয়ে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

ডায়াবেটিসের মতো একটি ক্রনিক রোগ, ব্যক্তি, পরিবার, দেশ এমনকি সারাবিশ্বের জন্য গুরুতর ঝুঁকি বহন করে– এমন সত্য অনুধাবন করে জাতিসংঘ। ২০০৬ সালের ২০শে ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৬১/২২৫ নম্বর ঘোষণায় ডায়াবেটিস দীর্ঘমেয়াদি, অবক্ষয়ী ও ব্যয়বহুল ব্যাধি হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। ডায়াবেটিস মানবদেহের মারাত্মক জটিলতার সৃষ্টি করে।

কোনো কোনো চিকিৎসাবিজ্ঞানী ডায়াবেটিসকে সকল রোগের জননী বলে অভিহিত করেন। কাঠের সাথে ঘুনের যে সম্পর্ক, শরীরের সাথে ডায়াবেটিসেরও সে সম্পর্ক। ডায়াবেটিস অনিয়ন্ত্রিত থাকলে শরীর ঘুণেধরা কাঠের মতো ভেঙে পড়ে। শরীরের হার্ট, কিডনি, চোখ, দাঁত, নার্ভ সিস্টেম-এ গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলো সম্পূর্ণ বা আংশিক ধ্বংস হতে পারে অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিসের কারণে। ডায়াবেটিস আক্রান্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশি ওজনের শিশু জন্ম, মৃত শিশুর জন্ম, অকালে সন্তান প্রসব, জন্মের পরেই শিশুর মৃত্যু এবং নানা ধরনের জন্মগত ত্রুটি দেখা দিতে পারে। আক্রান্ত হন নানা জটিল ব্যাধিতে।

উদ্বেগজনক হারে বাড়ছে ডায়াবেটিস। যা প্রতিটি পরিবারের উদ্বেগ। ডায়াবেটিস সব বয়সেই হতে পারে। উন্নয়নশীল দেশে এই রোগে আক্রান্তের হার বাড়ছে। প্রতিটি পরিবারেই রয়েছে ডায়াবেটিস রোগীকে নিয়ে দুশ্চিন্তা। এমনি পরিস্থিতিতে ১৪ই ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে পালিত হয়েছে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস। বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস উপলক্ষে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও সরকার, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান শোভাযাত্রা, আলোচনা সভাসহ নানাধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে– 'ডায়াবেটিস প্রতিটি পরিবারের উদ্বেগ'।

'ডায়াবেটিস প্রতিটি পরিবারের উদ্বেগ' প্রতিপাদ্যের বিষয়ে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ডা. এ কে আজাদ খান বলেন, বাংলাদেশসহ পৃথিবীতে এমন পরিবার নেই, যে পরিবারে অন্তত একজন ডায়াবেটিস কিংবা ডায়াবেটিস ঝুঁকিতে আছেন এমন মানুষ নেই। ফলে কোনো পরিবারে কেউ ডায়াবেটিস রোগী থাকলে তার ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কিংবা কেউ ডায়াবেটিসের ঝুঁকিতে থাকলে তার প্রতিকার নিয়ে উদ্বেগ থাকাটা স্বাভাবিক। সে কারণে বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতি শুরু থেকে ডায়াবেটিস প্রতিরোধের ওপর গুরুত্ব দিয়ে এসেছে। সম্প্রতি সমিতি এলক্ষ্যে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ এবং অনন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

রাষ্ট্রপতি তাঁর বাণীতে এ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সাফল্য কামনা করে আহ্বান জানিয়েছেন– বিশেষজ্ঞদের মতে পরিবর্তিত জীবনধারণসহ জিনগত ও অপরিকল্পিত গর্ভধারণের কারণেও ডায়াবেটিস বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বর্তমানে প্রায় প্রতিটি পরিবারেই ডায়াবেটিস উদ্বেগের

অন্যতম কারণ। এ প্রেক্ষাপটে এবারের 'বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস'-এর প্রতিপাদ্য 'ডায়াবেটিস প্রতিটি পরিবারের উদ্বেগ' যথাযথ হয়েছে বলে মনে করি। ডায়াবেটিস প্রতিরোধ করতে হলে এ রোগের ঝুঁকি এবং প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে। এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির কাজটি শুরু করতে হবে পরিবারের মধ্য থেকেই। আমি ডায়াবেটিস সম্পর্কে গণসচেতনতা বাড়াতে বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতির পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, গণমাধ্যমসহ সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাচ্ছি।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বাণীতে এ উপলক্ষে সকল কর্মসূচির সাফল্য এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রত্যাশা করেছেন– আমরা ২০০৯ সালে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করছি। আমরা একটি গণমুখী স্বাস্থ্যনীতি প্রণয়ন করেছি এবং এ নীতির বাস্তবায়ন করেছি। ... বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে সচেতনতা সৃষ্টিসহ নানামুখী কার্যক্রম করে চলছে। এ সমিতির উদ্যোগে রাজধানীসহ সারাদেশে গর্ভকালীন নারীদের বিনামূল্যে ডায়াবেটিস পরীক্ষা ও স্বল্পমূল্যে সেবা দিতে দেশব্যাপী সেবাকেন্দ্র খেলা হয়েছে। কাজীদের মাধ্যমে নবদম্পতিদের সচেতন করতেও বিশেষ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় একযোগে কাজ করছে। আমি আশা করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ডায়াবেটিস প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করে একটি সুস্থ জাতি গঠনের মাধ্যমে আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪০ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হব।

ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞদের মতে, পৃথিবীর অনেক দেশ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট উদ্যোগী ও বিভিন্ন মাত্রায় সফল; কিন্তু বাংলাদেশের চিত্র ভিন্ন। কেননা বাংলাদেশে সচেতনতার অভাবে অনেকেই এ রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। নানা কর্মসূচি অব্যাহত রাখার পরও ডায়াবেটিস রোগীর মাত্র ২৫ ভাগকে স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। এর প্রধান কারণ হলো বর্তমানে অর্ধেক রোগীই জানেন না তারা এতে আক্রান্ত। ফলে তারা থাকছেন চিকিৎসা আওতার বাইরে।

১০ জন নারীর মধ্যে ১ জন নারী ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। বিশেষজ্ঞদের মতে, নগরায়ণ ও পরিবর্তিত জীবনধারণের কারণে ডায়াবেটিস বাড়ছে, তেমনি গর্ভকালীন ডায়াবেটিসের সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায়, গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত নারীদের অর্ধেকের বেশি পরে টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হন। এমন অপরিকল্পিত গর্ভধারণের কারণে শিশু অপুষ্টির শিকার হয় এবং সেই শিশু পূর্ণ বয়স্ক হওয়ার পর অতিরিক্ত ওজন হলে তার ডায়াবেটিস হওয়ার ঝুঁকি বহুগুণ বেশি থাকে। গবেষণার তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে শতকরা ২০ ভাগ নারী গর্ভকালীন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। যাদের ৬৫ শতাংশই পরবর্তীকালে টাইপ-২ ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়।

বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতি গর্ভকালীন ডায়াবেটিস প্রতিরোধে গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা দিতে বিশেষ প্রকল্প হাতে নিয়েছে। এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি প্রসবকালীন নারী ও শিশু মৃত্যুর হার কমানো সম্ভব হবে, তেমনি নারীসহ আগামী প্রজন্মকে ডায়াবেটিসের ভয়াবহ প্রকোপ থেকে অনেকাংশে রক্ষা করা সম্ভব হবে। এ বিষয়ে বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস-২০১৮ উপলক্ষে বাডাস প্রকাশিত ক্রোড়পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে মে ২০১৬ সাল থেকে বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি (বাডাস) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা ও ওয়ার্ল্ড ডায়াবেটিস ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে 'গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা' নামক প্রকল্প পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি ও অধিভুক্ত সমিতির কেন্দ্র ও হাসপাতালে ৫০টি গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা কর্নার চালু করা হয়েছে। কর্নারগুলোতে 'গর্ভধারণ-পূর্ব সেবা' প্যাকেজের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় শারীরিক পরীক্ষা (পুষ্টি অবস্থা ও রক্তচাপ), রক্তপরীক্ষা (গ্লুকোজের মাত্রা, হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ও রক্তের গ্রুপ) ও প্রসাব পরীক্ষা (এলবুমিনের উপস্থিতি ও ইনফেকশন) করাতে পারেন। পাশাপাশি প্রকল্পটি থেকে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যকর্মীদের থেকে সঠিক চিকিৎসা ও পুষ্টি পরামর্শ নিয়ে থাকেন। এছাড়া মোবাইল হেল্পলাইন ও ফেসবুক গ্রুপের মাধ্যমে পরামর্শ নিতে পারেন।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত হলো– সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করলে রোগী নিজেই ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। ডায়াবেটিস এমন রোগ, স্বাস্থ্যশিক্ষাই যার প্রধান চিকিৎসা। যথাযথ স্বাস্থ্যশিক্ষা পেলে একজন ডায়াবেটিস রোগী এ রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। এ রোগের চিকিৎসার জন্য ডায়াবেটিস সম্পর্কে রোগীর যেমন শিক্ষা প্রয়োজন, তেমনি রোগীর নিকটাত্মীয়দেরও এই রোগ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার। ডায়াবেটিস রোগীকেই খাদ্য বব্যস্থা, নিয়মিত ওষুধ গ্রহণ এবং ব্যায়াম ও শৃঙ্খলা (তিনটি D– Diet, Drug, Discipline) মেনে চলতে হয়। বিশেষ করে বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে এই তিনটি ডি যথাযথভাবে পালন করতে পারলে রোগ নিয়ন্ত্রণে এসে যায়। সঠিক ব্যবস্থা নিলে এই রোগকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব।

প্রতিবছর বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসে বিশেষজ্ঞগণ ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন, তা হলো– ডায়াবেটিসের লক্ষণ নেই এমন লোকেরও ডায়াবেটিস পরীক্ষা করা যাতে ডায়াবেটিসের জটিলতা দেখা দেওয়ার আগে তাকে সঠিক চিকিৎসার আওতায় আনা যায়। একইসাথে ডায়াবেটিসের লক্ষণবিহীন সকলকে সচেতন করা। সর্বোপরি ডায়াবেটিস আক্রান্তদের সঠিক ব্যবস্থাপনার আওতায় এনে চিকিৎসা করা।

বাংলাদেশ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে অঙ্গীকারবদ্ধ। বাংলাদেশ সরকার এসডিজি বাস্তবায়ন পরিকল্পনায় স্বাস্থ্যসেবাতে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে। তবে টেকসই স্বাস্থ্যসেবা বাস্তবায়ন পদক্ষেপ হতে হবে বাস্তবসম্মত যাতে সারাদেশের সবলোকের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করা যায়। অন্যান্য দেশের ন্যায় আমাদের দেশের জন্যও এটি একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ। অবশ্য এজন্য সর্বাগ্রে সরকারকে মাতৃ ও শিশুমৃত্যু, মহামারি ও প্রাণঘাতী রোগসমূহ মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। এটা সহজেই অনুমেয় যে, এক্ষেত্রে অন্যতম অন্তরায় হলো ডায়াবেটিস। যেহেতু ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের মূলে রয়েছে স্বাস্থ্যশিক্ষা, সেহেতু স্বাস্থ্যশিক্ষা সম্পর্কে গণসচেতনতা তৈরি করতে পারলে একে নিয়ন্ত্রণে রাখা যেতে পারে।

ডায়াবেটিস সচেতনতায় প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলন। এই গণসচেতনতা আন্দোলন শুধু বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ ডায়াবেটিস সমিতিরই নয়, দেশের সর্বস্তরের আবালবৃদ্ধবণিতা সবারই। কেননা সব বয়সী লোকই ডায়াবেটিস আক্রান্ত হচ্ছে। ডায়াবেটিস সচেতনতায় সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ আবশ্যক। শুধু বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসে নয়, বরং প্রয়োজন বছরব্যাপী সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের সকল মাধ্যমে ডায়াবেটিস সচেতনতামূলক নিরন্তর প্রচারণাও। সরকারসহ সকল অংশীজন এমনকি সর্বসাধারণকেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে হবে। একইসাথে ব্যক্তি সচেতনতাও আবশ্যক। ব্যক্তিগত এমনকি পারিবারিক পর্যায়েও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে আন্তরিক প্রচেষ্টা শুরু হলে ডায়াবেটিসের ভয়াবহতা দূর করা যাবে। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সমন্বিত কর্মসূচি ও আন্তরিক প্রচেষ্টা সারাদেশে অব্যাহত রাখতে হবে। ডায়াবেটিস মোকাবিলায় যুগোপযোগী নতুন নতুন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও সরকারকে। আমাদের প্রত্যাশা, বাংলাদেশ সরকারের এসব কর্মসূচি সর্বোপরি গণসচেতনতা ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সাফল্য নিয়ে আসবে, যা ত্বরান্বিত করবে বর্তমান সরকার ও বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা' কর্মসূচি বাস্তবায়ন।

লেখক: প্রাবন্ধিক ও গবেষক

প্রতীক্ষায় তবু কেউ

আব্দুল্লাহ শিবলী সাদিক

[কিউবান কবি রবার্তো মেন্ডেজ মার্টিনেজের, The Survivor অবলম্বনে]

তোমার জন্য কেউ অপেক্ষায় থাকবে না
পুরনো ঘর, শুকনো পাতা
হয়ত লুকাবে মুখ আনমনে, অবাক হয়ে হয়ত কেউ।
বেঁচে ছিলে একদিন– সব চিহ্ন মুছে যায়
অথবা ভয় চোখে আঙুল ছোঁয়ায়, কেউ যদি রাখে মনে।
শ্বাস, অনুভব– পাঁজরের দেয়াল ভেঙে
গলে পড়ে সূর্যের আলোর মতো।
আর অন্ধকার চোখে তুমি জেগে থাকো
তোমারই ধ্বংসাবশেষ পাহারায়।
শুধু একজন তবু এখনো অপেক্ষায়– নিঃসঙ্গ রাতে
তোমার দু'হাত বেঁধে নেবে নিজের হাতে।

ঢেঁকি

রকিবুল ইসলাম

হেমন্তকাল, ধানের গোলায় ধান উঠেছে ওই
মাগো, তোমার ধানভানা সেই ঢেঁকিখানা কই?
উঠোনজুড়ে কানায় কানায়
ঢেঁকি ছাড়া ধান কি মানায়!
ধানের গন্ধে ঘুম আসে না একলা জেগে রই
মাগো, তোমার ধানভানা সেই ঢেঁকিখানা কই?
সেদিন হতে ঢেঁকিতে মা ধান কেন না ভানো
ঢেঁকির ঘরে থাকে কেন পর্দাটা নামানো!
বাড়িতে ধান আসে যখন
ঢেঁকি বলে ডাকি তখন
ও ঘর থেকে কেন মা আর ঢেঁকি শুনে নাকো
আমি ডাকি তুমি কেন চুপটি করে থাকো?
বল মা, ঢেঁকি কোথায় গেছে, আসবে আবার কবে?
কাল যে আমার নতুন ধানে পিঠার মেলা হবে!
ঢেঁকির মতো ফাঁকি দিয়ে
ধানও যদি লুকায় গিয়ে
তুমি তখন একলা ঘরে কেমন করে রবে?
ঢেঁকিও নাই, ধানও নাই কেমন মজা হবে!

[কবি যোতীন্দ্রমোহন বাগচী রচিত 'কাজলা দিদি' কবিতা অবলম্বনে]

এসেছে হেমন্ত দিন

শাফিয়া আকতার

তাবৎ আকাশ আহা! নীলিমায় নীল ছিল কাল
কাল ছিল সারারাত হিম হিম হৈমন্তিক হাওয়া
কখনো শুক্লার সুর কখনো বা সলীলের গানে
মৌ মৌ গন্ধ ছিল জল-ঢেউ গোলাপ বাগানে।
কাল ছিল মেঘমুক্ত রৌদ্রময় দিন
তিথি নক্ষত্রসহ ছিল মিষ্টি সকাল
লাল নীল গোলাপি রঙে ভরা ছিল বিস্তৃত শস্য মাঠ
কাল সারারাত তার ঘর ছিল আলোময় রুদ্ধ কপাট।
এসেছে হেমন্ত দিন নীলাকাশে তারাদের মেলা
ডাকাতিয়া নদীবুকে বালিহাঁস জলডুব পাখিদের খেলা।

হেমন্তের জোসনা ছায়া

শাহ্ সোহাগ ফকির

হে জোসনা! হে বন্ধু!
তোমাকে দিলাম এই হেমন্তের স্বরলিপি,
কৃষাণের ঘামঝরা ভরদুপুর
আউশ ধানের উচ্ছল হাসি
পড়ন্ত সূর্যের স্নিগ্ধ সৌরভ।
হে বিশ্বাস! হে আমার শ্রদ্ধা!
তোমাকে দিলাম নতুন কৃষাণির
নথ কাঁপা মিষ্টি হাসি,
নীড়ে ফেরা পাখির ব্যাস্ত ডানার শব্দ
নতুন চালের গন্ধে ঢেঁকির গীত
আমি তোমাকেই শোনাব।
হে আগামী! হে দূরন্ত স্রোত!
তোমাকে দিলাম সবুজ পাতা
প্রজাপতির পাখার অবিরাম আলপনা,
ভোরের গতিময় রোদ
বাবার মাথার নতুন গামছা
ধানভানা বাংলা মায়ের স্নিগ্ধ আঁচল।

অভিগামী মন

এস এম তিতুমীর

ছল করিনি জীবন ঘষা পথের কাছে
রাত্রি যারা ভালোবাসে তাদের মুখে আয়না ধরে
এই চেয়েছি– সূর্য আনুক সূর্য থেকে
বিলক্ষণই চেতনাকে নিজের মতো শোয়াক জাগাক
সভ্যতারই শুভ্রতা থাক চোখেমুখে
পাথরভাঙা হাতের কাছে এই চেয়েছি।
বাসলে না হয় একটু ভালো
মিথ্যেতো নয়। যাওয়া-আসার নিদেনকালে
খোঁপায় তোলা বেলি ফুলের সুবাস দিলে
ছল করিনি গ্রহণ করার অনুরাগে
খুব ছুটেছি স্বেচ্ছাচারী জীবন নিয়ে তোমার সাথে
তাই বলেছ– লুকোচুরি আর কতকাল
স্বেচ্ছাচারী নেহাতই এক দস্যিপনা, রাগ করে না।
তাই তো এখন রাগহীন পথ। আগুন লুকায় তোমার ভেতর
তোমার থেকেই চুরি করি তোমার বারুদ
বন্দি ভেবেই ভালোবাসি তোমার গারদ
চোখ মোড়ানো তোমার ছবি পায়ে পায়ে
তুমিই এখন জ্বালাও জ্বলো, জো করি না ডাইনে বাঁয়ে।

প্রোটোফিলিস

জসীম আল ফাহিম

এলাকায় তান্ত্রিক বলে পরিচিত শওকত আলীকে এইমাত্র কড়াবন্দি করে ওসি সাহেব থানায় নিয়ে গেলেন। ষাটোর্ধ্ব শওকত আলী কথা বলেন খুব কম। সব সময় গম্ভীর ভাব নিয়ে চলেন। তার মাথাভরা কাশফুল শুভ্র চুল। দীঘল শুভ্র দাড়ি-গোঁফ। কোটরাগত চোখ। চোখের ওপর পুরু গ্লাসের চশমা। চশমাটা সব সময় নাকের ওপর ঝুলে থাকে। সফেদ পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে তিনি সারাদিন শুধু হাঁটাহাঁটি করেন। এ পাড়া থেকে ও পাড়ায়। এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে। কেন যে তার এত হাঁটাহাঁটি তা কেউ জানে না। ব্যাপারটা রহস্যজনক নয় কি? তার এ বিষয়টা নিয়ে এলাকায় লোকজন নানান কথা বলাবলি শুরু করে। এরইমধ্যে কেউ একজন নাকি শওকত আলীর বিরুদ্ধে থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগও করে। তাই বলা যায়, হাঁটাহাঁটির রহস্য উদঘাটন করার জন্যই ওসি সাহেব তাকে পাকড়াও করেছেন। শওকত আলীকে থানায় নিয়ে ওসি সাহেব ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করেন। জিজ্ঞাসাবাদের ধরন অনেকটা এমন।

–নাম কী তোমার?

–জি, আমার নাম শওকত আলী।

–শুধু শওকত আলী? আগে পিছে কিছু নেই?

–জি আছে। নামের আগে আছে।

–নামের আগে কী আছে?

–নামের আগে 'মোহাম্মদ' আছে স্যার।

–তো সেটা বলোনি কেন?

–এই তো বললাম স্যার।

–কী বলেছ?

–নাম বলেছি স্যার।

–কী বলেছ নাম?

–মোহাম্মদ শওকত আলী স্যার।

–শওকত আলী স্যার! তুমি কি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নাকি হে? নামের শেষে 'স্যার' বলছ কেন?

–এমনি বলছি স্যার।

–এমনি বলছ মানে কী?

–মানে এমনি এমনি বলছি আর কি।

–এমনি এমনি কোনো কিছু বলা ঠিক নয়। যা বলবে কাজের কথা বলবে। অকারণ কথা বলা বাঁদরামি। বাঁদরামি আমার পছন্দ নয়। তুমি বাঁদর নাকি?

–জি না স্যার।

–তাহলে তুমি কী?

–স্যার আমি একজন তান্ত্রিক। জাদুবিদ্যা জানি।

–জাদুবিদ্যা জানো! কীরকম জাদু?

–এগুলো বিজ্ঞানের জাদু স্যার।

–বিজ্ঞানের জাদু! সেটা আবার কী জিনিস?

–আমার একটি ল্যাবরেটরি আছে স্যার। আমি সেখানে গবেষণা করি।

–কী গবেষণা করো?

–বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা স্যার।

–তোমার পড়াশোনা কতটুকু?

–রসায়ন শাস্ত্রে অনার্স পড়েছি স্যার।

–তা তোমার পেশা কী?

–পেশা কিছু নেই স্যার।

–পেশা নেই বলছ। তাহলে তোমার চলে কেমন করে? বিয়ে করেছ? ছেলেমেয়ে আছে?

–জি না স্যার। বিয়ে করিনি। ছেলেমেয়েও নেই।

–বিয়ে করোনি তো ছেলেমেয়ে আসবে কোথা থেকে? আচ্ছা

শওকত আলী। তোমার বিরুদ্ধে যে লিখিত অভিযোগ রয়েছে, সে সম্পর্কে তুমি কিছু জানো?

–জি না স্যার। জানি না।

–আচ্ছা তুমি নাকি সারাদিন শুধু হাঁটাহাঁটি করো?

–জি স্যার। এক জায়গায় বসে থাকতে আমার ভালো লাগে না স্যার। তাই হাঁটহাঁটি করি।

–আচ্ছা তোমার গবেষণার বিষয় কী?

–উদ্ভিদ, লতাপাতা এসব স্যার।

–তুমি রসায়ন শাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করেছ বলছ, অথচ উদ্ভিদ লতাপাতা এসব নিয়ে গবেষণা করো। বিষয়টা কী? খুলে বলো তো শুনি।

–বিষয় কিছু না স্যার। এটা আমার কৌতূহল বলতে পারেন।

–কৌতূহল! কৌতূহল থাকা ভালো। তবে তারও একটি সীমারেখা থাকা চাই। তা কি তুমি জানো?

–জি স্যার। জানি স্যার।

–জানোই যদি তাহলে তুমি লোকের খেতখামারের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে কয়েকদিনের মধ্যে ফসলের ক্ষতি হয় কেন?

–তা জানি না স্যার।

–জানো না বললে তো চলবে না। ঠিক ঠিক জবাব দাও। আমার নাম মহরম আলী ওসি। আসামির পেট থেকে কীভাবে কথা বের করতে হয়, তা আমার ভালোই জানা আছে। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে আমি আঙুল বাঁকাতে বাধ্য হব।

বলে ওসি মহরম আলী একটু দম নিলেন। শওকত আলীর বিরুদ্ধে তার কাছে একগাদা অভিযোগ এসেছে। সে নাকি এলাকার ধনী লোকদের কাছে চাঁদা দাবি করে। চাঁদা দিয়ে দিলে কোনো সমস্যা হয় না। তবে চাঁদা না দিলেই নাকি লোকের ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বিষয়টা বড়োই রহস্যজনক। ওসি সাহেব সেই রহস্যেরই জট খুলতে চেষ্টা করছেন। কিছু সময় পর তিনি আবার শওকত আলীকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নাকি লোকের কাছে চাঁদা চাও। কথাটা কি ঠিক?

–জি না স্যার। ডাহা মিথ্যে কথা, স্যার। আমি কোনোদিন কারো কাছে চাঁদা দাবি করিনি স্যার। তবে মাঝেমধ্যে...

–মাঝেমধ্যে কী?

–মাঝেমধ্যে সামান্য হাদিয়া দাবি করি স্যার।

–কীরকম হাদিয়া?

–আসমানি বালা-মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকার জন্য হাদিয়া স্যার।

–হাদিয়া না দিলে কি বালা-মুসিবত অবধারিত?

–জি স্যার। শওকত আলী জোর গলায় বলে। পরক্ষণেই আবার সে 'জি না স্যার' 'জি না স্যার' করতে থাকে। তার এমন এলোমেলো কথাবার্তা শুনে ওসি সাহেব রাগত কণ্ঠে বলেন, শওকত আলী–আমি তোমার মুখের দাঁতগুলো একেবারে উপড়ে ফেলব। মিথ্যে কথা বলো কেন–হ্যাঁ? প্রথমে তো ঠিকই বলেছিলে।

–জি স্যার। জি না স্যার।

–শওকত আলী ভালোয় ভালোয় সত্য স্বীকার করো। নইলে ভালো হবে না কিন্তু।

ওসি মহরম আলীর জেরার মুখে শওকত আলী কিছুটা বেসামাল হয়ে পড়ে। পরে সে সত্য-মিথ্যা মিশেল করে গড়বড় করে জবাব দিতে থাকে। তার এরূপ জবাব শুনে ওসি সাহেবের মনমেজাজ দমনের বাইরে চলে যায়। তিনি আরো রেগে গিয়ে বলেন, সহজ লোক নও হে তুমি। তোমাকে বানাতে হবে দেখছি। বলে তিনি এসআই রুমেলকে ডাকলেন।

এসআই রুমেল থানার একজন চৌকস কর্মকর্তা। ওসি মহরম আলী বললেন, এ বড়োই ঘাগু লোক। পেট থেকে সহজে কথা বের হচ্ছে না। ওকে একটু বানাতে হবে। জলদি নিয়ে যাও। ওর পেটে ডান্ডা দিয়ে গুঁতিয়ে দেখো কথা কিছু বের করতে পারো কি-না।

ওসি সাহেবের নির্দেশ পেয়ে এসআই রুমেল শওকত আলীর চুলের মুঠি ধরে টেনে-হেঁচড়ে অন্য একটি রুমে নিয়ে গেলেন। ছোটোখাটো রুম। রুমে একটিমাত্র দরজা। কোনো জানালা নেই। রুমের ভেতর একটিমাত্র চেয়ার পাতানো। বৈদ্যুতিক চেয়ার। গুরুতর অপরাধীর পেট থেকে কথা বের করার জন্য এই চেয়ারে বসিয়ে বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হয়। এসআই রুমেল লোকটিকে নিয়ে সেই চেয়ারে বসিয়ে দিলেন। তারপর দেয়ালের সাথে লাগানো সুইচে চাপ দিতেই শওকত আলী যন্ত্রণায় একবারে কঁকিয়ে ওঠে। মুহূর্তেই তার চোখ দুটো যেন অন্ধকার হয়ে যায়। তার সারা শরীরে সুঁই ফোটার মতো কিছু একটা ব্যাপার ঘটে। পরক্ষণেই তিনি যন্ত্রণায় উঁহু-হু-হু করে ওঠেন। আর চেঁচিয়ে বলেন, ও মাগো কী ভয়ংকর যন্ত্রণা! প্লিজ যন্ত্রটা একটু থামান। আমি সবকিছু খুলে বলছি। প্লিজ যন্ত্রটা থামান।

এসআই রুমেল সুইচ অফ করতে করতে বললেন, সব ঠিক ঠিক বলিস কিন্তু। কী করে লোকের খেতখামারের ফসল নষ্ট হয়ে যায় সবকিছু– বলে তিনি সুইচটা অফ করে দিলেন।

শওকত আলী চেয়ার থেকে উঠে মেঝেতে গিয়ে বসলেন। এমন সময় সেখানে ওসি মহরম আলীও এসে হাজির হলেন। শওকত আলী কিছুসময় চুপ হয়ে থেকে বলতে শুরু করলেন। দীর্ঘ বিশ বছর ধরে আমি একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করছি। প্রাণী দেহের সজীব কোষের সাথে কয়েক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে আমি একপ্রকার নতুন জীবাণু তৈরি করেছি। যা উদ্ভিদের ক্লোরোফিল খেয়ে রাতারাতি বংশবিস্তার ঘটাতে সক্ষম। ক্লোরোফিলের মান ভালো হলে একরাতে জীবাণুটি সংখ্যায় কয়েক কোটি পর্যন্ত ছাড়িয়ে যেতে পারে। আমি উদ্ভিদের ক্ষতিকারক এই জীবাণুটির নাম দিলাম–প্রোটোফিলিস ভাইরাস। প্রোটোপ্লাজম থেকে তৈরি তাই এরূপ নামকরণ।

আপনারা আমাকে বলছেন যে, আমি লোকের কাছে চাঁদা দাবি করি। কথাটি আসলে ঠিক নয়। জীবনের দীর্ঘ বিশ বছর ধরে বিষয়টা নিয়ে গবেষণা করে আমি একপ্রকার সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছি। গবেষণা কাজে ব্যাঘাত ঘটবে ভেবে জীবনে বিয়ে পর্যন্ত করিনি। গবেষণা কাজের জন্য আমি নিরিবিলি পরিবেশ পাব ভেবে শহুরে আয়েশি জীবন ছেড়ে এই অজপাড়াগাঁয়ে চলে এসেছি। গবেষণায় আমি ঠিকই সফল হয়েছি। কিন্তু আমার এখন আর দিন চলে না। পেট যখন আছে, পেটে খিদেও আছে। পেটে খাবার দিতে হয়। আমি একজন স্বাধীনচেতা মানুষ। লোকের কাছে হাত পাতার অভ্যাস আমার নেই। তাই আমি একটি কৌশল অবলম্বন করেছিলাম মাত্র। ভেবেছিলাম এভাবেই আমি জীবনটা পার করে দিতে পারব। কিন্তু কৌশল অবলম্বন করেও কিছু লাভ হলো না। শেষমেষ ধরা পড়ে গেলাম।

শওকত আলীর সব কথা শুনে ওসি মহরম আলী এবং এসআই রুমেল অবাক হয়ে গেলেন। লোকটা একজন বিজ্ঞানী–ভাবা যায়! হোক না তার আবিষ্কারটা মানবকল্যাণবিরোধী। তবুও তো একটা মূল্যবান জিনিস সে আবিষ্কার করেছে। নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তারা শওকত আলীর কাছে ক্ষমা চাইলেন।

পরে ওসি মহরম আলী শওকত আলীর জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করে তাকে আদালতে সোপর্দ করলেন। বিজ্ঞ আদালত শওকত আলীর বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আমলে নিলেন। আদালত শওকত আলীকে মানবতাবিরোধী সকল কর্মকাণ্ড বাদ দিয়ে মানবকল্যাণমূলক আবিষ্কার চালিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। আর তার গবেষণা কাজে সকল ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করার জন্য রাষ্ট্রের কাছেও জোর সুপারিশ করলেন।

পিস অ্যান্ড হারমোনি

শেখ হাসিনাকে নিবেদিত ৭১টি কবিতার কাব্যগ্রন্থ

ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মণ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার ৭১তম জন্মদিন পালিত হয়েছে ২৮শে সেপ্টেম্বর। তিনি রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান হিসেবে ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন সোনার বাংলা বিনির্মাণের পথে শেখ হাসিনার নিরলস প্রচেষ্টা এবং এলক্ষ্যে ধারাবাহিক সাফল্য অর্জনে তাঁকে শুধু বাংলাদেশেই নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশও অনুসরণ ও অনুকরণ করে। তিনি বাংলাদেশকে এক অনন্য উচ্চতায় অধিষ্ঠিত করেছেন। তিনি শুধু বাংলাদেশের একজন জাতীয় নেতাই নন, তিনি একজন বিচক্ষণ বিশ্বনেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি রাজনৈতিক নেতৃত্বের এক রোল মডেল।

কিছু মানুষের বর্ণিল ও বর্ণাঢ্য যশস্বী কর্মকাণ্ডের জন্য তাঁরা হয়ে ওঠেন কবির কবিতার উপজীব্য। তেমনি মানুষকে নিয়ে কবিতা রচনা করতে গেলে সেই মানুষটিকে কবিতার উপযোগী হতে হয়, এরকম কিছু মানুষকে কবিতায় তুলে আনা কবির জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে। বিশেষত যিনি জাতির উন্নয়নে জাতীয় দায়িত্ব পালন করেন– শেখ হাসিনা এমন একজন নেত্রী। সেই কারণে তার ৭১তম জন্মদিন উদ্‌যাপন উপলক্ষে ৭১জন কবির ৭১টি বাংলা কবিতা ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে *পিস অ্যান্ড হারমোনি* শীর্ষক কাব্যগ্রন্থ। আনিস মুহম্মদ অনূদিত ও অধ্যাপক আহমেদ রেজা সম্পাদিত এই কবিতা গ্রন্থটিতে দেশের খ্যাতিমান ৭১ জন কবির শেখ হাসিনাকে নিয়ে লেখা ৭১টি কবিতা ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির বাংলা নামকরণ করা হয়েছে 'শান্তি ও সহাবস্থান'।

কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশনা অনুষ্ঠানে আয়োজকরা জানান, ইংরেজি ছাড়াও বইটিকে ৭১টি ভাষায় অনুবাদ করা হবে। বইটি প্রকাশ করেছে গল্পকার। এর পরিবেশক ম্যাগনাম ওপাস। প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী মাসুক হেলাল। গ্রাফিক্স শিল্পী এস এম বিল্লাল হোসেন। উৎসর্গ করা হয়েছে শেখ হাসিনাকে। দাম ৬০০ টাকা।

কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশনা উৎসব পরিষদের উদ্যোগে ২৪শে অক্টোবর ২০১৮ বাংলা একাডেমির আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মিলনায়তনে প্রকাশনা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. নাসরীন আহমাদ। সভাপতিত্ব করেন বইটির প্রকাশনা পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক পান্না কায়সার। এতে আরো বক্তব্য রাখেন বইটির ইংরেজি অনুবাদক কবি আনিস মুহম্মদ, বইটির সম্পাদক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক আহমেদ রেজা, কবি আজিজুর রহমান আজিজ, অভিনেত্রী শমী কায়সার প্রমুখ।

কেন্দ্রীয় খেলাঘরের শিশু শিল্পীদের 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্যসুন্দর' গানটি পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা ঘটে। এতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওপর ও বইটির ওপর দুটি প্রমাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। মঞ্চের পর্দায় সারাক্ষণ গ্রন্থটিতে লেখা কবিতার ৭১ জন কবির প্রতিকৃতি প্রদর্শিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃত্যকলা বিভাগের শিক্ষক মনিরা পারভীন হ্যাপির নৃত্য পরিবেশনার পর শুরু হয় আলোচনা পর্ব। আলোচনা শেষে বুলবুল ললিতকলা একাডেমির শিল্পীরা কবিদের কবিতার ওপর গান পরিবেশন এবং কবিদের স্বকণ্ঠে কবিতা পাঠ অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা অনুষ্ঠানে জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো তাঁর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অসীম সাহস, দৃঢ় মনোবল ও অভীষ্ট লক্ষ্যে অবিচল থেকে সকল চ্যালেঞ্জ এবং ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আরো বলেন, '৭১ বাঙালির জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ একটি সংখ্যা। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মাস এই '৭১। পিতার মতোই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনারও বাংলার মানুষের প্রতি অপার ভালোবাসা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে জন্ম নেওয়া এই দেশকে উন্নতির পথে, পূর্ণতার পথে নিয়ে চলেছেন। তাই তাঁর '৭১তম জন্মদিনকে তাঁকে নিয়ে লেখা কাব্যগ্রন্থের প্রকাশনা উদযাপনের মধ্য দিয়ে সেই উন্নতি ও পূর্ণতার ক্ষণটিকে উদ্‌যাপন করা। এই উদ্যোগটি অনন্য, চমৎকার।

জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, শেখ হাসিনাকে উপলক্ষ করে লেখা কবিতায় উঠে এসেছে বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ, মুক্তিযুদ্ধ, বাংলার প্রকৃতি, নদী, ফুল। কারণ বাংলাদেশ মানেই বঙ্গবন্ধু, গ্রামবাংলার মানুষ, প্রকৃতি এবং দেশকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এটি দুর্লভ একটি গ্রন্থ।

অধ্যাপক পান্না কায়সার বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজ বিশ্বের মানুষের কাছে এক অনন্য নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। কী কারণে তাঁর এই খ্যাতি, তা হচ্ছে তাঁর দেশ গঠনে অভাবিত পরিশ্রম, আপোশহীন কর্মকাণ্ড এবং স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী দেশের উন্নয়নে অসীম সাহস ও দক্ষতার পরিচয় দেওয়া।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা, আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিবেদিত কবিতার সংখ্যা অসংখ্য। কবিরা গত আড়াই দশকে প্রচুর কবিতা লিখেছেন শেখ হাসিনাকে নিয়ে। সেসব কবিতা থেকে বাছাই করে অনুবাদক ও সম্পাদক একাত্তরটি কবিতা এ গ্রন্থটিতে প্রকাশ করেছেন।

গ্রন্থটির 'ভূমিকা'য় সম্পাদক অধ্যাপক আহমেদ রেজা ও অনুবাদক আনিস মুহম্মদ যৌথভাবে লিখেছেন– শেখ হাসিনার চরিত্রের নানান আলো আর বিভা, শোক ও দুঃখ, আনন্দ আর অভিযাত্রা মূর্ত হয়েছে এই কাব্যগ্রন্থে সংকলিত একাত্তরটি কবিতায়। দুটি বিষয়কে স্মরণে রেখে আমরা কাব্যপ্রেমিক এই মহান ব্যক্তিকে নিয়ে লেখা একাত্তরটি অনুপম কবিতা একত্রে প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। পাশাপাশি সারাবিশ্বে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ধারণা প্রসারের যে অনন্য নজির তিনি স্থাপন করেছেন, তা বিবেচনা করে এই গ্রন্থের নাম 'শান্তি ও সহাবস্থান'।

কবীর চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, রফিক আজাদ, নির্মলেন্দু গুণ, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, তোফাজ্জল হোসেন, বেলাল চৌধুরী, আনোয়ারা সৈয়দ হক, কাজী আবু জাফর সিদ্দিকী, রবিউল হুসাইন, মহাদেব সাহা, হাবীবুল্লাহ সিরাজী, অসীম সাহা, মুহম্মদ নূরুল হুদা, নূহ উল আলম লেনিন, আখতার হুসেন, কাজী রোজী, শিহাব সরকার, হালিম আজাদ, নাসির আহমেদ, কামাল চৌধুরী, ইয়াফেস ওসমান, আজিজুর রহমান আজিজ, মুহম্মদ সামাদ, তারিক সুজাতসহ ৭১ জন কবির লেখা কবিতা রয়েছে 'পিস অ্যান্ড হারমোনি' গ্রন্থটিতে।

লেখক: প্রাবন্ধিক

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২৩শে অক্টোবর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় প্যালেইস দ্য নেশন্‌সে বিশ্ব বিনিয়োগ ফোরাম-২০১৮-এর শীর্ষ সম্মেলনে ভাষণ দেন–পিআইডি

রাষ্ট্রপতি : বিশেষ প্রতিবেদন

বিশ্ব বিনিয়োগ ও উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা সম্মেলনে রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ পাঁচ দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ২২শে অক্টোবর ২০১৮ সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সফরকালে তিনি বিশ্ব বিনিয়োগ ও উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা বিষয়ক দুটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন '২০তম গ্লোবাল লিডারস ইনভেস্টমেন্ট সামিট' এবং '২০তম হোমল্যান্ড অ্যান্ড গ্লোবাল সিকিউরিটি ফোরাম' বার্ষিক অধিবেশনে যোগ দেন। বিশ্ব বিনিয়োগ ফোরামে তিনি বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এবং এতে অংশ নেওয়া দেশগুলোর প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এ সময় মানবসম্পদ, শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়নে আরো বেশি বিনিয়োগ করার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি। এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল– 'টেকসই উন্নয়নের জন্য বিনিয়োগ'। পাঁচ দিনের সফর শেষে রাষ্ট্রপতি ২৭শে অক্টোবর দেশে ফেরেন।

স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে যোগ্য নেতৃত্ব গড়ে তুলতে হবে

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ বলেন, স্কাউটিংয়ের মাধ্যমে আগামী দিনের যোগ্য নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে। আর এজন্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্কাউট নেতৃবৃন্দ, অভিভাবক, শিক্ষক, জনপ্রতিনিধিসহ সবাইকে এগিয়ে আসতে আন্তরিক হওয়ার আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি। তিনি বলেন, 'আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে আধুনিক, প্রগতিশীল ও সৃজনশীল জাতি হিসেবে গড়ে তুলতে স্কাউটিং কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। স্কাউটেরা হলো চেঞ্জ মেকার'।

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সঙ্গে ৫ই নভেম্বর ২০১৮ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বাংলাদেশ স্কাউটস-এর জাতীয় কাউন্সিলের ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্‌বোধন এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট পদকপ্রাপ্তরা ফটোসেশনে অংশ নেন–পিআইডি

৫ই নভেম্বর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে বাংলাদেশ স্কাউটস-এর জাতীয় কাউন্সিলের ৪৭তম বার্ষিক সাধারণ সভায় রাষ্ট্রপতি এসব কথা বলেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, পরোপকারী ও স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে একজন স্কাউট সকলের স্নেহ ও ভালোবাসা অর্জন করতে পারে। লেখাপড়ার পাশাপাশি স্কাউটরা দুর্যোগকালীন দ্রুত সাড়াদান, নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে অবদান এবং জঙ্গিবাদ ও মাদকবিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ, স্বাস্থ্যসেবা, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ক্যাম্প, স্যানিটেশন, বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ রক্ষার মতো বিভিন্ন সমাজ গঠনমূলক কাজে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। এছাড়া স্কাউট নেতৃবৃন্দের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি বলেন, স্কাউটেরা যাতে মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করতে পারে সেলক্ষ্যে স্কাউট নেতৃবৃন্দকে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। তিনি সাম্প্রতিক সময়ে স্কাউট আন্দোলনে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বিভিন্ন স্কাউট পদকপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানান।

সাংবাদিকদের তথ্যভিত্তিক সংবাদ দেওয়ার আহ্বান

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ সাংবাদিকদের উদ্দেশে বলেন, নিজের অবস্থান থেকে দেশকে এগিয়ে নিতে সবাইকে কাজ করতে হবে। ৫ই নভেম্বর বঙ্গভবনে সাংবাদিকদের সম্মানে দেওয়া এক নৈশভোজে তিনি একথা বলেন। রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, সাংবাদিকদের তথ্যভিত্তিক সংবাদ দিতে হবে। কারণ তথ্যভিত্তিক সংবাদ মানুষের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়। এ সময় বঙ্গভবনে আমন্ত্রিত প্রত্যেক সাংবাদিকের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন রাষ্ট্রপতি। নৈশভোজে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাংবাদিকসহ উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সংবাদপত্র ও টেলিভিশনের কর্তাব্যক্তিবর্গ।

প্রতিবেদন: প্রসেনজিৎ কুমার দে

প্রধানমন্ত্রী : বিশেষ প্রতিবেদন

একনেকে ২১ প্রকল্প অনুমোদন: কারাগারে কোর্টরুম রাখার অনুশাসন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৩শে অক্টোবর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ২১টি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন দেন। এছাড়া তিনি মামলা পরিচালনার জন্য দেশের প্রতিটি জেলখানায় কোর্টরুম স্থাপনের অনুশাসন দেন। কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প অনুমোদনের সময় তিনি এ অনুশাসন দেন।

দেশের প্রথম বার্ন ইউনিটের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪শে অক্টোবর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন চানখারপুলে ৫০০ শয্যার 'শেখ হাসিনা বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট'-এর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই ইনস্টিটিউটে বিশ্বের সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতিসহ উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকবে, যাতে দগ্ধ কাউকে চিকিৎসার জন্য বিদেশ যেতে না হয়। এছাড়া দেশে চিকিৎসকদের মান উন্নত করতেও যা যা দরকার তা করার কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। পরে তিনি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যান এবং চিকিৎসাধীন রোগীদের খোঁজখবর দেন।

বিএএফ একাডেমিতে বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে অক্টোবর যশোরে বাংলাদেশ এয়ার ফোর্স (বিএএফ) একাডেমির প্যারেড গ্রাউন্ডে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি ব্রোঞ্জ নির্মিত আবক্ষমূর্তি উন্মোচনের মাধ্যমে 'বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স'-এর উদ্‌বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী জাতির পিতার অপরিসীম প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টিকে ধারণ করে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে একত্রে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বিমানবাহিনীকে আরো আধুনিক করার কথাও উল্লেখ করেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বিমান সেনা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং ১০৫ জেট ট্রেনিং ইউনিটের কার্যক্রমের উদ্‌বোধন ঘোষণা করেন।

বিমানবাহিনীর এয়ার মুভমেন্ট ফ্লাইটের নতুন ভিভিআইপি কমপ্লেক্স উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে অক্টোবর তেজগাঁও বিমানবন্দরে সেনাবাহিনীর 'এয়ার মুভমেন্ট ফ্লাইটের নতুন ভিভিআইপি কমপ্লেক্স'-এর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী ঢাকার মতো শহরে দ্বিতীয় একটি বিমানবন্দরের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন এবং এ বিমানবন্দর যাতে 'বেহাত' না হয় সেজন্য বিমানবাহিনীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান।

বরগুনায় ২১ উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭শে অক্টোবর বরগুনায় ২১টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ একটি শান্তিপূর্ণ দেশ। এ দেশ কখনো সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদকের দেশ হবে না। ইসলামে জঙ্গিবাদের কোনো স্থান নেই। এলক্ষ্যে তিনি যুব ও ছাত্রসমাজ যাতে সন্ত্রাসী ও মাদকে জড়িয়ে না পড়ে সেজন্য অভিভাবক ও শিক্ষকদের ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

ডেসটিনেশন বাংলাদেশ শীর্ষক আন্তর্জাতিক ব্যবসায়িক সম্মেলনের উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮শে অক্টোবর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে 'ডেসটিনেশন বাংলাদেশ' শীর্ষক আন্তর্জাতিক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪শে অক্টোবর ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন চানখারপুল এলাকায় নবনির্মিত শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮শে অক্টোবর ২০১৮ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ডেসটিনেশন বাংলাদেশ শীর্ষক আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন–পিআইডি

ব্যবসায়ী সম্মেলনের উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী রপ্তানি আয় বাড়াতে পণ্যের বহুমুখীকরণের পাশাপাশি নতুন রপ্তানি বাজার খোঁজার এবং বেসরকারি খাতে বিনিয়োগের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি দেশকে বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ করতে সকলকে আন্তরিকভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীকে ডিসিসিআই-এর পক্ষ থেকে 'ভিশনারি লিডারশিপ' অ্যাওয়ার্ডে ভূষিত করা হয়।

শেখ হাসিনা চট্টগ্রাম হিল ট্রাক্টস কমপ্লেক্স-এর উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮শে অক্টোবর বেইলি রোডে 'শেখ হাসিনা চট্টগ্রাম হিল ট্রাক্টস কমপ্লেক্স'-এর উদ্‌বোধন করেন। উদ্‌বোধনকালে প্রধানমন্ত্রী পাহাড়ে শান্তি বজায় রাখার ওপর জোর দেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বিরোধ নিরসনে ভূমি কমিশনকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান।

শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার হাসপাতাল উদ্‌বোধন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১শে অক্টোবর মহাখালীর বক্ষব্যাধী হাসপাতাল প্রাঙ্গণে 'শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল ভবন' উদ্‌বোধন এবং আরো কয়েকটি স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার। তিনি চিকিৎসকদের কেবল পেশা হিসেবে নয়, মহান ব্রত নিয়েই আন্তরিকভাবে মানুষের সেবা করার আহ্বান জানান। এছাড়া প্রবাসী বাংলাদেশি চিকিৎসকদের দেশের জন্য কাজ করারও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

২৯৭টি প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও ২৪টির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১লা নভেম্বর গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ২০টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগের আওতাধীন দেশের ৫৬টি জেলায় ২৯৭টি প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও ২৪টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি এ সময় সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ ও মাদকমুক্ত করে বাংলাদেশকে উন্নত, সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার আশাবাদ ব্যক্ত করে চলমান মাদকবিরোধী অভিযান অব্যাহত রাখার এবং আরো জোরদার করার নির্দেশ দেন। পরে প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বাগেরহাট, পিরোজপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ঢাকার উত্তরার ১৮ নম্বর সেক্টর এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এলাকার স্থানীয় জনগণ, প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও উপকারভোগীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩১শে অক্টোবর ২০১৮ মহাখালীর বক্ষব্যাধি হাসপাতাল প্রাঙ্গণে শেখ রাসেল গ্যাস্ট্রোলিভার ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল উদ্‌বোধনসহ কয়েকটি স্বাস্থ্যসেবা প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে মোনাজাত করেন–পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫শে অক্টোবর ২০১৮ যশোরে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী একাডেমিতে বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স-এর উদ্‌বোধন শেষে উপস্থিত কর্মকর্তাদের সঙ্গে ফটোসেশনে অংশ নেন–পিআইডি

ময়মনসিংহে উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২রা নভেম্বর ময়মনসিংহের সার্কিট হাউস মাঠে এক জনসভায় অংশগ্রহণ করেন। জনসভাস্থল থেকে প্রধানমন্ত্রী সুইচ টিপে বিভাগের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ১০১টি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্‌বোধন ও ৯৪টি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

ঢাকায় নৌঘাঁটি উদ্‌বোধন

বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ নৌঘাঁটি হিসেবে 'বিএনএস শেখ মুজিব'-এর কমিশনিং করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ৫ই নভেম্বর খিলক্ষেত এলাকায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে এই প্রথম কোনো নৌঘাঁটির কমিশনিং করা হয়। এ সময় তিনি নৌবাহিনীর কর্মকর্তা, নাবিক ও বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের বসবাসের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম ও খুলনা অঞ্চলে ২২টি নবনির্মিত বহুতল ভবনও উদ্‌বোধন করেন। তিনি এ বাহিনীকে আরো আধুনিক করা হবে বলে উল্লেখ করেন এবং বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিভিন্ন ঐতিহাসিক অর্জন নিয়ে লেখা *বাংলাদেশ নেভি ইন দ্য টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি* বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন।

প্রতিবেদন: সুলতানা বেগম

তথ্য মন্ত্রণালয় : বিশেষ প্রতিবেদন

অর্থনীতিতে নারীদের অবদান গণনায় আনতে হবে

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেন, নারী বাদ দিলে অর্থনীতি হয় খোঁড়া, আর গণতন্ত্র হয় পঙ্গু। গণতান্ত্রিক ও আধুনিক ডিজিটাল সমাজ গড়তে দেশের অর্থনীতিতে নারীদের অবদান গণনায় আনতেই হবে। ১৫ই অক্টোবর 'আন্তর্জাতিক গ্রামীণ নারী দিবস' উপলক্ষে জাতীয় প্রেস ক্লাবের কনফারেন্স লাউঞ্জে উইমেন জার্নালিস্ট নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ (ডব্লিউজেএনবি) এবং মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের যৌথ আয়োজনে 'অর্থনীতিতে গ্রামীণ নারীর অবদান' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন তিনি।

তথ্যমন্ত্রী সভায় মহান মুক্তিযুদ্ধে এদেশের নারীদের অবদান অসামান্য বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন, দেশের বিস্ময়কর উন্নয়নের পেছনে গৃহকর্মের পাশাপাশি শস্য উৎপাদন, পশুপালন, মৎস্য চাষ, তৈরি পোশাক উৎপাদনসহ বিভিন্ন খাতে গ্রাম ও শহরের নারীদের অবদান অসামান্য। তিনি নারীদের শিক্ষা, সম্পদ, ক্ষমতায়ন ও কাজের সুযোগপ্রাপ্তি নিশ্চিত করতে সরকারের পাশাপাশি সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

গণমাধ্যমের জন্য নয় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু বলেছেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের ডিজিটাল নিরাপত্তার জন্য করা হয়েছে, গণমাধ্যমের জন্য নয়। ১৬ই অক্টোবর নিজ বাসভবনে রুরাল জার্নালিস্ট ফাউন্ডেশন (আরজেএফ)-এর প্রতিনিধিদের সভায় একথা বলেন তিনি।

সভায় তথ্যমন্ত্রী বলেন, এই আইন করা হয়েছে নারী-শিশুসহ সকলের ব্যক্তিগত এবং সমাজ ও রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য। সাইবার অপরাধী ও হ্যাকারদের হাত থেকে ডিজিটাল জগতের নিরাপত্তার জন্য। এই আইনের কোনো জায়গায় গণমাধ্যমের কর্মীদের কথা বলা হয়নি। তথ্যমন্ত্রী আরো বলেন, সেইসাথে মনে রাখা দরকার সংবিধানের ৩৯ ধারা, তথ্য অধিকার আইন, সম্প্রচার আইন, গণমাধ্যম কর্মী আইন। এ সকল আইন সমুন্নত রেখেই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন কাজ করবে।

সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশে' রূপান্তরিত করেছেন। সর্বক্ষেত্রে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আগে মাতৃত্বকালীন ছুটি ছিল চার মাস, এখন তা বর্ধিত হয়ে ছয় মাস হয়েছে। ৩০ প্রকারের ওষুধ আমাদের দেশে বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে আমাদের বাজেট ছিল ৬১ হাজার ৫৭ কোটি টাকা। ২০১৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪ লাখ ২৬৬ কোটি টাকা। এজিপি বাজেট ছিল ২০০৫-০৬ সালে মাত্র ১৬ হাজার কোটি টাকা। বর্তমানে তা ১ লাখ ৬৪ হাজার কোটি টাকা হয়েছে। ২১শে অক্টোবর টাঙ্গাইলে শহিদ স্মৃতি পৌর উদ্যানে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু ১৫ই অক্টোবর জাতীয় প্রেস ক্লাবে গ্রামীণ অর্থনীতিতে নারীর অবদান শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন–পিআইডি

সমাবেশে তথ্য প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কর্ণফুলী টানেলসহ ১০ বছরে সরকার বয়স্ক ভাতা দিয়েছে ১৪ হাজার ১৯৯ কোটি টাকা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত ভাতা দিয়েছে ৫ হাজার ২৬৭ কোটি টাকা, অসচ্ছল ও প্রতিবন্ধী ভাতা দিয়েছে ৩ হাজার ২৬৭ কোটি টাকা, শিক্ষা উপবৃত্তি দিয়েছে ৪ হাজার ৬১৬ কোটি টাকা, প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি দিয়েছে ১০ বছরে ১ হাজার ১৭১ কোটি টাকা, এতিমদের দিয়েছে ৬৬৫ কোটি টাকা। বর্তমান সরকার ২০১৮ সালে ২ কোটি ৫০ লাখ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ১০ কোটি ৭০ লাখ বই বিতরণ করেছে।

তথ্য প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম ২১শে অক্টোবর টাঙ্গাইলের শহিদ স্মৃতি পৌর উদ্যানে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সমাবেশে বক্তৃতা করেন

তথ্য প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ১৫টি কমিউনিটি বেতার ও ৪৪টি টিভি চ্যানেল সম্প্রচারসহ ঢাকা থেকে ২২১টি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। শিক্ষা খাত ছিল ২০০৯ সালে মাত্র ৪৪ শতাংশ, বর্তমানে ৭৩ শতাংশ। ২০০৯ থেকে এ পর্যন্ত ১২ হাজার ৪৯২টি শিক্ষা কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। ৯ বছরে প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ে মোট ১ লাখ ৯ হাজার ৫৭৮ জন শিক্ষক নিয়োগ ও ১ লাখ ৩ হাজার শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করা হয়েছে। ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক স্কুল সরকারিকরণ করা হয়েছে। এ বছর শিক্ষাক্ষেত্রে ৫৩ হাজার ৫০৪ কোটি টাকা বাজেটে বরাদ্দ হয়েছে, যা মোট বাজেটের ১২ শতাংশ। প্রতিটি মানুষের প্রতি বর্তমান সরকারের সহানুভূতি রয়েছে।

দেশকে চিরসবুজ রাখবে শতবর্ষের বদ্বীপ পরিকল্পনা

তথ্যসচিব আবদুল মালেক বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শতবর্ষের যে মহাপরিকল্পনা নিয়েছেন, সেই 'ডেল্টা প্ল্যান' বদ্বীপ পরিকল্পনা এদেশকে চিরসবুজ রাখবে। ১৮ই অক্টোবর জাতীয় প্রেস ক্লাবে জার্নালিস্টস ফর ডেভেলপমেন্ট আয়োজিত 'ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ' বিষয়ক আলোচনা সভায় আমন্ত্রিত অতিথির বক্তৃতায় একথা বলেন তিনি।

তথ্যসচিব আরো বলেন, ২১০০ সালেও যাতে বাংলাদেশের পরিবেশ, প্রকৃতি ও জলবায়ু সবুজ ও মনোরম থাকে, পাখির কলতানে মুখরিত একটি নদীমাতৃক দেশ যেন ভবিষ্যতের প্রজন্ম পায়, সেই মহান লক্ষ্যেই প্রধানমন্ত্রী এ বদ্বীপ পরিকল্পনা নিয়েছেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা বাস্তবায়িত হবে।

প্রতিবেদন: শারমিন সুলতানা শান্তা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩রা নভেম্বর ২০১৮ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে জেল হত্যা দিবসে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আয়োজিত স্মরণ সভায় বক্তৃতা করেন–পিআইডি

জাতীয় ঘটনার প্রতিবেদন

জাতীয় যুব দিবস

১লা নভেম্বর: বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালিত হয় 'জাতীয় যুব দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'জেগেছে যুব গড়বে দেশ, বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ'।

জেল হত্যা দিবস পালিত

৩রা নভেম্বর: যথাযোগ্য মর্যাদায় সারাদেশে জেল হত্যা দিবস পালিত হয়।

একনেক বৈঠক

৪ঠা নভেম্বর: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে এনইসি সম্মেলন কক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) বৈঠকে পুলিশ ও র‍্যাবের সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আবাসিক সুবিধা নিশ্চিত করতে ৭টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়।

বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস

১২ই নভেম্বর: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'বিশ্ব নিউমোনিয়া দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'নিউমোকক্কাস ও হিব ভ্যাকসিনের পরবর্তী অবস্থান'।

আয়কর মেলা

১৩ই নভেম্বর: জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে ১৩ থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত সারাদেশে 'আয়কর মেলা' অনুষ্ঠিত হয়। 'উন্নয়ন ও উত্তরণ, আয়করের অর্জন'– এ স্লোগানকে সামনে রেখে এ বছর আয়কর মেলার প্রতিপাদ্য ছিল– 'আয়কর প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার ও ধারাবাহিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ'।

বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস

১৪ই নভেম্বর: বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও বিভিন্ন সংগঠন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে পালন করে 'বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবস'। এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য ছিল– 'ডায়াবেটিস প্রতিটি পরিবারের উদ্বেগ'।

১৮ই নভেম্বর: সারাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী ও ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা শুরু হয়। প্রাথমিকে ২৭ লাখ ৭৭ হাজার ২৭০ জন এবং ইবতেদায়ীতে ৩ লাখ ১৭ হাজার ৮৫৩ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

প্রতিবেদন: আখতার শাহীমা হক

আন্তর্জাতিক : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশ রূপান্তরিত হয়েছে উন্নয়নের মহাকাব্যে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণতাপূর্ণ নেতৃত্বে বাংলাদেশ রূপান্তরিত হয়েছে উন্নয়নের মহাকাব্যে বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ফেকিটেমোয়েলা কাটোয়া ইউটোই কমানো।

নিউইয়র্কে বাংলাদেশ কনস্যুলেট মিলনায়তনে ১০ই নভেম্বর 'বাংলাদেশ উন্নয়ন মেলা'য় বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি একথা বলেন। জাতিসংঘে বাংলাদেশ মিশন ও নিউইয়র্ক কনস্যুলেট জেনারেল অফিস এ মেলার আয়োজন করে।

জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি ফেকিটেমোয়েলা কাটোয়া বলেন, 'বাংলাদেশ রূপান্তরিত হয়েছে উন্নয়নের এক মহাকাব্যে, যা আমাদের শেখাচ্ছে– লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় অঙ্গীকার, জাতীয় নেতৃত্বে বলিষ্ঠতা এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সমগ্র জনগোষ্ঠীকে উজ্জীবিত করা।

অনুষ্ঠানে ভারতীয় কনসাল জেনারেল ও রাষ্ট্রদূত সন্দীপ চক্রবর্তী বলেন, বড়ো ধরনের প্রকল্প গ্রহণের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে ওঠেনি। এটা সম্ভব হয়েছে উন্নয়ন পরিক্রমায় সমগ্র জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করা, জনগণকে ক্ষমতায়িত করা, নারী ক্ষমতায়ন, শিক্ষা-স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। তিনি বলেন, বাংলাদেশের এই উন্নয়নের ধারাক্রম গোটা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন

সিঙ্গাপুরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিভিয়ান বালাকৃষ্ণান ৪ঠা নভেম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনকালে বলেন, রোহিঙ্গা সংকট নিরসনে তার দেশ বাংলাদেশের পাশে আছে। তবে এই সংকটের সমাধান দ্রুত আসবে

বাংলা একাডেমির আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মিলনায়তনে ৮ই নভেম্বর 'ঢাকা লিট ফেস্ট ২০১৮'-এর উদ্‌বোধন করেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর

না। এর স্থায়ী সমাধানে দরকার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা। ক্যাম্প পরিদর্শনকালে বালাকৃষ্ণান ১৫-২০ জন রোহিঙ্গার সঙ্গে কথা বলেন। তাদের কাছে মিয়ানমার সেনাদের নির্যাতনের বর্ণনা শুনে তিনি বলেন, রাখাইন রাজ্যে যে ঘটনা ঘটেছে, তা ক্ষমার অযোগ্য। রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ায় বালাকৃষ্ণান বাংলাদেশের প্রশংসা করেন।

ঢাকা লিট ফেস্ট: সাহিত্যের দিকপালদের মহামিলন

বিশ্বসাহিত্যের দিকপালদের উপস্থিতিতে বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে উৎসবমুখর। ৮ থেকে ১০ই নভেম্বর চলে বিশ্বের নামকরা সব সাহিত্যিকদের এ আসর। ৮ই নভেম্বর এ উৎসব উদ্‌বোধন করেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর। উৎসবে অংশগ্রহণ করেন ২৫ দেশের দুই শতাধিক সাহিত্যিক, বক্তা, পারফরমার ও চিন্তক। ছিল শতাধিক সেশন, আলোচনা, পারফরম্যান্স, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, আনপ্লাগড মিউজিক কনসার্টসহ নানা আয়োজন।

উৎসবের প্রথম দিন পাকিস্তানি লেখক সাদাত মান্টোকে নিয়ে ভারতে নির্মিত ছবি 'মান্টো'র প্রথম প্রিমিয়ার হয়। আর দ্বিতীয় দিনে ঘোষণা করা হয় জেমকল সাহিত্য পুরস্কার এবং প্রথমবারের মতো লঞ্চ করা হয় ক্যামব্রিজ শর্ট স্টোরি প্রাইজ। উৎসবে বিদেশি অতিথি ছিলেন পুলিৎজার বিজয়ী মার্কিন সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ অ্যাডাম জনসন, পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ লেখক ও কলামিস্ট মোহাম্মদ হানিফ, ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক ফিলিপ হেনশের, বুকার বিজয়ী ব্রিটিশ ঔপন্যাসিক জেমস মিক, ভারতীয় জনপ্রিয় লেখিকা জয়শ্রী মিশ্রা, লন্ডন ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব রাইটিংয়ের পরিচালক কথাসাহিত্যিক রিচার্ড বিয়ার্ড, ভারতীয় লেখিকা হিমাঞ্জলি শঙ্কর, শিশুতোষ লেখিকা মিতালি বোস পারকিন্স, ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল এশিয়ার প্রধান হুগো রেস্টল, মার্কিন সাংবাদিক প্যাট্রিক উইন, লেখক-সাংবাদিক নিশিদ হাজারি। বাংলাদেশের সাহিত্যপ্রেমীদের জন্য এবারের উৎসবে বড়ো আকর্ষণ ছিল ভারতীয় লেখক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। এছাড়া দ্বিতীয়বারের মতো ঢাকা লিট ফেস্টে আসেন অস্কার বিজয়ী অভিনেত্রী টিলডা সুইন্টন। বলিউড কাঁপানো অভিনেত্রী মনীষা কৈরালা উৎসবের শেষদিন শোনান তার ক্যানসার জয়ের গল্প। লিট ফেস্টের সমাপনীতে প্রধান অতিথি ছিলেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত।

প্রতিবেদন: সাবিনা ইয়াসমিন

উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচকে এগিয়েছে বাংলাদেশ

বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচকে ভারত-পাকিস্তানকে পেছনে ফেলে আরো দুই ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। ৮৮তম স্থান থেকে এবার ৮৬তম স্থানে বাংলাদেশ– যেখানে ভারত ১০০ থেকে তিন ধাপ পিছিয়ে ১০৩ এবং ভারতের তিন ধাপ পেছনে ১০৬তম স্থানে পাকিস্তান। অপুষ্টি, শিশু মৃত্যুর হার, শিশু বৃদ্ধির হার ও কম ওজনে ভোগা পাঁচ বছরের শিশুদের হার ইত্যাদি বেশকিছু নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে তৈরি করা হয়েছে এ সূচক। গত ১৩ বছর ধরে এ সূচক তৈরি করছে ওয়েলথাংগারহালফ অ্যান্ড কনসার্ন ওয়ার্ল্ডওয়াইড। এবারো তারা ১১৯টি দেশের মধ্যে এ সমীক্ষা করেছে।

এদিকে শুধুমাত্র বৈশ্বিক ক্ষুধা সূচকেই নয়, মানবসম্পদ সূচকেও এগিয়ে বাংলাদেশ। বিশ্বব্যাপী পরিচিত মেডিক্যাল জার্নাল ল্যানসেটে প্রকাশিত সাম্প্রতিক এক গবেষণায় বলা হয়েছে, এ সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ১৬১ এবং পাকিস্তান রয়েছে ১৬৪তম অবস্থানে।

রপ্তানি আয়ে ধারাবাহিক উন্নতি

চলতি অর্থবছরের জুলাই-অক্টোবর চার মাসে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় আয় বেশি হয়েছে প্রায় ১৯ শতাংশ। অন্যদিকে একক মাস হিসেবে অক্টোবরে গত বছরের একই মাসের তুলনায় প্রায় ৩১ শতাংশ রপ্তানি বেশি হয়েছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের গত চার মাসে মোট ১ হাজার ৩৬৫ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে। আগের একই সময়ের তুলনায় রপ্তানি বেড়েছে ২১৫ কোটি ডলার। শতাংশের হিসাবে বেড়েছে ১৮ দশমিক ৬৫ শতাংশ। লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় রপ্তানি বেড়েছে প্রায় ১৩ শতাংশ। এই আয়ের ৯৪৪ কোটি ডলারই এসেছে পোশাক রপ্তানি থেকে। এ

খাতের আয় আগের একই সময়ের তুলনায় বেড়েছে ২০ শতাংশ, একই সময়ের তুলনায় রপ্তানি বেড়েছে ৮০ শতাংশ। ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, পোশাকের বাইরে উল্লেখযোগ্য রপ্তানি পণ্যের মধ্যে ওষুধের রপ্তানি বেড়েছে ৩৫ শতাংশ। প্রায় সাড়ে চার কোটি ডলারের ওষুধ রপ্তানি হয়েছে এ সময়।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ২৮শে অক্টোবর ২০১৮ ঢাকার পূর্বাচলে 'টিচিং অ্যান্ড ট্রেনিং পেট হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার' উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

পোষা প্রাণীর হাসপাতালের যাত্রা

চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও অ্যানিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (সিভাসু)-এর উদ্যোগে ঢাকার পূর্বাচলে নির্মিত হয়েছে দেশের প্রথম পোষা প্রাণী হাসপাতাল। ইন্টার্ন ও স্নাতকোত্তর ভেটেরিনারি ডাক্তারদের হাতেকলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে অত্যাধুনিক ও বিশ্বমানের এই হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে। ২৮শে অক্টোবর 'টিচিং অ্যান্ড ট্রেনিং পেট হসপিটাল অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার' নামের এ হাসপাতালের আনুষ্ঠানিক উদ্‌বোধন করা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এই হাসপাতাল ও গবেষণা কেন্দ্র উদ্‌বোধন করেন। পূর্বাচল নিউ টাউনের ১৮ নম্বর সেক্টরের ১১৪ নম্বর সড়কের এই হাসপাতালে প্রাণী চিকিৎসকেরা হাতেকলমে চিকিৎসায় প্রশিক্ষণ নেওয়ার পাশাপাশি পোষা প্রাণীর বিভিন্ন রোগ নিয়ে বিশেষভাবে গবেষণার সুযোগ পাবেন। এই হাসপাতালে প্রাথমিকভাবে ২০টি প্রাণী ভর্তি রাখা যাবে। এছাড়া প্রতিদিন ৪০ থেকে ৫০টি প্রাণীর চিকিৎসা করানো যাবে। দুজন প্রশিক্ষিত প্রাণী চিকিৎসক সার্বক্ষণিক এই হাসপাতালে থাকবেন।

১১টি ফসলে প্রণোদনা পাবে কৃষক

সরকার ১১টি কৃষিপণ্যে ৮০ কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করেছে। এসব টাকা সরাসরি কৃষকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে অথবা মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে কৃষকের হাতে পৌঁছে যাবে। ৭ই অক্টোবর সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী সাংবাদিকদের কাছে এ তথ্য প্রকাশ করেন। এ টাকা কৃষি মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব বাজেট থেকে সংকুলান করা হবে। অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হবে না।

প্রণোদনা দেওয়া হবে গম, ভুট্টা, সরিষা, চীনাবাদাম, ফেলন, খেসাড়ি, বিটি বেগুন, বোরো, শীতকালীন মুগ ও তিল পণ্যে। ৬ লাখ ৯০ হাজার ৯৭০ জন ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক এই প্রণোদনা পাবে। প্রতিটি কৃষক পরিবার সর্বোচ্চ এক বিঘা জমির জন্য বিনামূল্যে বীজ ও সারের বিপরীতে নগদ অর্থ পাবে। গম, ভুট্টাসহ এই ১১টি ফসল আবাদে কৃষককে উৎসাহ দেওয়া, ফসলের আবাদ এলাকা বৃদ্ধি, ফলন বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক কারণে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই প্রণোদনা।

ব্র্যান্ড ভ্যালুতে বাংলাদেশের অগ্রগতি

ব্র্যান্ড ভ্যালুতে পাঁচ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। বিশ্বে সর্বোচ্চ মূল্যবান দেশের ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ৩৯তম। সম্প্রতি লন্ডনভিত্তিক বৈশ্বিক ব্র্যান্ড মূল্যায়নকারী প্রতিষ্ঠান ব্র্যান্ড ফিন্যান্সের 'নেশন ব্র্যান্ডস ২০১৮' শীর্ষক প্রতিবেদনে এ তথ্য উঠে এসেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের ব্র্যান্ড ভ্যালু এ বছর ২৫৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। ২০১৭ সালে ১০০টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৪৪তম। সে সময় রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের ব্র্যান্ড ভ্যালু ছিল ২০৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ বছর বাংলাদেশের ব্র্যান্ড ভ্যালু বেড়েছে ২৪ শতাংশ।

প্রতিবেদন: শাহানা আফরোজ

ডিজিটাল বাংলাদেশ

প্রধানমন্ত্রীর কাছে ডিজিটাল বিষয়ক আন্তর্জাতিক তিন পুরস্কার হস্তান্তর

দেশের প্রথম বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট প্রকল্পে পাওয়া আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিসহ তিনটি পুরস্কার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ১২ই নভেম্বর সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকের শুরুতে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের জন্য 'অ্যাসোসিও অ্যাওয়ার্ড'সহ আরো দুটি অ্যাওয়ার্ড– 'অ্যাসোসিও ডিজিটাল গভর্নমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' এবং 'গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ড অব চাইল্ড লেবার এলিমিনেশন অ্যান্ড ইমপ্রুভমেন্ট অব ওয়ার্কার্স সিচুয়েশনস' হস্তান্তর করা হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব জানান, জাপানে অনুষ্ঠিত 'অ্যাসোসিও ডিজিটাল সামিট-২০১৮' তে আউটস্ট্যান্ডিং আইসিটি কোম্পানিজ হিসেবে বাংলাদেশ কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএসসিএল) 'অ্যাসোসিও অ্যাওয়ার্ড' পায়। এই অ্যাওয়ার্ড প্রধানমন্ত্রীকে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অবকাঠামো উন্নয়ন 'ইনফো সরকার-৩' প্রজেক্ট দেশের ২ হাজার ৬০০টি ইউনিয়নে গ্রামের সাধারণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ১২ই নভেম্বর বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ১-এর নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ সংক্রান্ত সনদ তুলে দেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার–পিআইডি

মানুষের কাছে ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে ইন্টারনেট অবকাঠামো তৈরির স্বীকৃতিস্বরূপ ডিজিটাল অ্যাওয়ার্ড ক্যাটাগরিতে 'অ্যাসোসিও ডিজিটাল গভর্মেন্ট অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করে। এই পুরস্কারও প্রধানমন্ত্রীর কাছে হস্তান্তর করা হয়।

বাংলাদেশের শিল্প কারখানায় শ্রমিকবান্ধব পরিবেশের তাৎপর্যপূর্ণ মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ অস্ট্রিয়ার ক্ষমতাসীন দল বাংলাদেশকে 'গ্লোবাল অ্যাওয়ার্ড অব চাইল্ড লেবার এলিমিনেশন অ্যান্ড ইমপ্রুভমেন্ট অব ওয়ার্কার্স সিচুয়েশনস'-এ ভূষিত করে। এই পুরস্কারও প্রধানমন্ত্রীর কাছে তুলে দেওয়া হয়।

প্রধানমন্ত্রীর হাতে পুরস্কার তিনটি তুলে দেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার এবং শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক চুন্নু।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বুঝে পেল বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের ছয় মাসের মাথায় এর মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে বুঝে পেল বাংলাদেশ। এখন থেকে এই স্যাটেলাইটের রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালনাসহ সব দায়িত্ব বাংলাদেশের। ৯ই নভেম্বর রাজধানীর কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ-এ বাংলাদেশ কমিউনেকশন স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএসসিএল) কার্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে স্যাটেলাইটের নিয়ন্ত্রণ বুঝিয়ে দেয় স্যাটেলাইট নির্মাণকারী ফরাসি প্রতিষ্ঠান থ্যালেস অ্যালেনিয়া স্পেস। এ প্রতিষ্ঠানের প্রোগ্রাম ম্যানেজার জিল অবাদিয়া বিটিআরসির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জহুরুল হকের কাছে 'ট্রান্সফার অব টাইটেল' হস্তান্তর করেন।

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার অনুষ্ঠানে বলেন, আজকের দিন দেশের মানুষের জন্য স্মরণীয় দিন। এ স্যাটেলাইট কতদিনে লাভজনক হবে তারচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ– এটি বাংলাদেশের একটি অর্জন, একটি গর্বের বিষয়।

উল্লেখ্য, ১২ই মে বাংলাদেশ সময় রাত ২টা ১৪ মিনিটে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে সফলভাবে উৎক্ষেপণ করা হয় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১। বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইটের মালিক হয় বাংলাদেশ। গাজীপুরের তেলিপাড়া এলাকায় বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের প্রধান গ্রাউন্ড স্টেশন অবস্থিত। আর এর সাপোর্টিং গ্রাউন্ড স্টেশন রাঙামাটিতে।

প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ সফটওয়্যার তৈরি করছে সরকার

ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষদের প্রতিবন্ধিত্ব দূরীকরণে বাংলা ভাষাভিত্তিক তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সেবা নিশ্চিত করতে সফটওয়্যার তৈরি করছে সরকার। এ সফটওয়্যারের মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক কিন্তু বলতে বা শুনতে অসমর্থ এমন ব্যক্তিরা উপকার পাবেন বলে জানিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার। ৮ই নভেম্বর কারওয়ান বাজারের জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কের সভাকক্ষে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্পের আওতায় 'প্রতিবন্ধীদের জন্য সফটওয়্যার উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালায়' প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা জানান।

'গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হচ্ছে। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সাইন ল্যাংগুয়েজ, মুখভঙ্গি বা জেসচারকে ইউনিকোড টেক্সটে রূপান্তর এবং তা থেকে অটোমেটিক স্পিচ জেনারেট (generate) করা। এর মাধ্যমে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা একটি মোবাইল ফোনের ক্যামেরার সামনে বাংলা সাইন ল্যাংগুয়েজ প্রদর্শন করবে। অর্থাৎ তার হাত, হাতের আঙুল, মুখমণ্ডলের নড়াচড়ার মাধ্যমে সাইন ল্যাংগুয়েজ প্রদর্শন করবে, মোবাইলের অ্যাপ এ সাইনকে রিকগনাইজ করবে এবং তাকে বাংলা ইউনিকোড টেক্সট হিসেবে প্রদর্শন করবে। একই সঙ্গে এ টেক্সট থেকে বাংলা স্পিচ জেনারেট হবে। এর নাম হবে 'অটোমেটিক রিয়েল টাইম বাংলা সাইন-জেসচার ডিটেকশন অ্যান্ড টেক্সট-স্পিচ জেনারেশন সিস্টেম' (ভাইস-ভার্সা)। এ সিস্টেমটি নির্দিষ্ট কোনো ডিভাইস ডিপেনডেন্ট হবে না।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফফাত আঁখি

শিক্ষা : বিশেষ প্রতিবেদন

সরকারি হলো আরো ৪ মাধ্যমিক স্কুল

দেশে আরো ৪টি মাধ্যমিক স্কুলকে সরকারি করা হয়েছে। ২৯শে অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ এ সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বদলি হতে পারবেন না। এছাড়া সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় নেই এমন উপজেলায় একটি করে বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলকে সরকারি ঘোষণা করেছে সরকার।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৪ঠা নভেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে কওমি মাদ্রাসাসমূহের দাওরায়ে হাদিস-এর সনদকে মাস্টার্স ডিগ্রি সমমান স্বীকৃতি প্রদান উপলক্ষে আয়োজিত শোকরানা মাহফিলে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয় ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে

কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ সনদ দাওরায়ে হাদিসকে ইসলামিক স্টাডিজের মাস্টার্সের সমমানের স্বীকৃতি দেওয়ায় ৪ঠা নভেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজন করা হয় শোকরানা মাহফিল। কওমি মাদ্রাসাগুলোর সর্বোচ্চ সংস্থা আল হাইয়াতুল উলয়া-লিল জামিআতিল কওমিয়া বাংলাদেশ এ মাহফিলের আয়োজন করে। মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মাহফিলে ভাষণকালে প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা তখনই পূর্ণাঙ্গ হয়, যখন ধর্মীয় শিক্ষাও গ্রহণ করা যায়। লাখ লাখ শিক্ষার্থী কওমি মাদ্রাসায় পড়াশোনা করছেন। তাদের সে শিক্ষার যদি স্বীকৃতি না থাকে তবে তারা কোথায় যাবে। এলক্ষ্যে সরকারের এ স্বীকৃতি দান। তিনি আলেম ও মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের কল্যাণে নেওয়া তাঁর সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যারা সত্যিকারের ইসলামে বিশ্বাসী তারা কখনো সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী হতে পারে না। যারা জঙ্গি বা সন্ত্রাসী তাদের কোনো ধর্ম নেই, তাদের দেশ নেই, তাদের কোনো সমাজ নেই। পরে আলেমদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে 'কওমি জননী' উপাধি দেন গোপালগঞ্জের গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসার মহাপরিচালক কওমি শিক্ষা বোর্ড গওহরডাঙ্গার চেয়ারম্যান মুফতি রুহুল আমীন। এছাড়া কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আল্লামা শাহ আহমদ শফী শোকরিয়া স্মারক প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেন।

নয়টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, সরকার সবার জন্য শিক্ষাগ্রহণ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে দেশে ৩৩৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে। আরো ৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। রংপুর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগীয় শহর, জয়পুরহাট জেলা ও শ্রীমঙ্গলের চা বাগান এলাকায় স্থাপন করা হবে এসব বিদ্যালয়। ৪৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে '৯টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয় একনেক সভায়। চলতি বছর থেকে ২০২১ সালের জুন মাসের মধ্যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার কথা রয়েছে।

প্রতিবেদন: মো. সেলিম

শিল্প-বাণিজ্য : বিশেষ প্রতিবেদন

বাংলাদেশের ব্র্যান্ড ইমেজ বেড়েছে

দেশ হিসেবে বাংলাদেশের 'ব্র্যান্ড ইমেজ' বা ভাবমূর্তি বেড়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে গত বছরের তুলনায় চলতি বছর শুধু বাংলাদেশের ইমেজই বেড়েছে। বাংলাদেশের এই ব্র্যান্ড ইমেজের আর্থিক মূল্য ২৫ হাজার ৭০০ কোটি (২৫৭ বিলিয়ন) মার্কিন ডলার। এটি দক্ষিণ এশিয়ায় দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

'নেশন ব্র্যান্ডস ২০১৮' প্রতিবেদনে এই চিত্র উঠে এসেছে। অক্টোবর ২০১৮ সালে বৈশ্বিকভাবে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ব্র্যান্ড ফাইন্যান্স। ১৯৯৬ সাল থেকে এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে আসছে প্রতিষ্ঠানটি। প্রতিষ্ঠানটি তিনটি প্রধান বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে একটি দেশের ইমেজ বা ভাবমূর্তি নির্ণয় করে। বিষয়গুলো হলো পণ্য ও পরিসেবার মান, বিনিয়োগ এবং সমাজ। এগুলো আবার পর্যটন, বাজার, সুশাসন এবং জনগণ ও দক্ষতা– এই চারটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশের ব্র্যান্ড ইমেজ নির্ভর করে সামগ্রিক অর্থনীতির ওপর। বিশ্ববাজারে এটি একটি বড়ো সম্পদ।

এবারের প্রতিবেদনে বিশ্বের ১০০টি দেশের ব্র্যান্ড ইমেজ তুলে ধরা হয়েছে। এরমধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার চারটি দেশ রয়েছে। এগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কা। ভারত ও বাংলাদেশ বিশ্বের ৫০টি গুরুত্বপূর্ণ ব্র্যান্ড ইমেজ সম্পন্ন দেশের তালিকায় স্থান পেয়েছে। এক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান নবম। গত বছর দেশটির অবস্থান ছিল আট। আর চলতি বছর বাংলাদেশের অবস্থান হয়েছে ৩৯তম। গত বছর অবস্থান ছিল ৪৪। সেই হিসেবে বাংলাদেশের ৫ ধাপ উন্নতি হয়েছে।

পোশাক রপ্তানি ২০ শতাংশ বেড়েছে

দেশের রপ্তানি আয়ে সুসময় চলছে। চলতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রথম চার মাসে রপ্তানি আয় বেড়েছে প্রায় ১৯ শতাংশ। বাড়তি এই আয় এসেছে পোশাক ও কৃষিজাত পণ্য থেকে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো (ইপিবি) ৬ই নভেম্বর রপ্তানি আয়ের হালনাগাদ পরিসংখ্যান প্রকাশ করে। এতে দেখা যায়, চার মাসে পোশাক রপ্তানি আয় বেড়েছে প্রায় ২০ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে দেশের পোশাক রপ্তানিকারকেরা ১৮৯ কোটি ডলার বাড়তি এনেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৬ই নভেম্বর তাঁর কার্যালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন–পিআইডি

চলতি অর্থবছরে চার মাসে পোশাক খাতে মোট আয় হয়েছে ১ হাজার ১৩৩ কোটি ডলার। এরমধ্যে ওভেন পোশাক বা প্যান্ট-শার্ট রপ্তানি করে আয় হয়েছে ৫৪৬ কোটি ডলার, যা আগের বছরের চেয়ে প্রায় ২৩ শতাংশ বেশি। আর নিট বা গেঞ্জি জাতীয় পোশাক রপ্তানি করে আয় হয়েছে ৫৮৮ কোটি ডলার, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ১৮ শতাংশ বেশি।

মন্ত্রিসভায় রপ্তানি নীতি অনুমোদন

রপ্তানি বাণিজ্যে গতিশীলতা সৃষ্টি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিযোগিতামূলক করা এবং বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করতে মন্ত্রিসভা রপ্তানি নীতি ২০১৮-২১-এর খসড়া অনুমোদন করেছে। ৬ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে তাঁর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার সাপ্তাহিক বৈঠকে এ অনুমোদন দেওয়া হয়।

প্রতিবেদন: মো. জামাল উদ্দিন

নারী : বিশেষ প্রতিবেদন

‘কওমি জননী’ উপাধি পেলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষায় সর্বোচ্চ স্তরের সনদের সরকারি স্বীকৃতি দেওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ‘কওমি জননী’ বলে ঘোষণা দিয়েছেন বেসরকারি মাদ্রাসার আলেমগণ। ৪ঠা নভেম্বর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আয়োজিত শোকরানা মাহফিলে এই ঘোষণা দেওয়া হয়।

কওমি মাদ্রাসা শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদিসকে স্নাতকোত্তর (ইসলামিক শিক্ষা ও আরবি) স্বীকৃতি দিয়ে জাতীয় সংসদে আইন পাস করায় কওমি মাদ্রাসাগুলোর সর্বোচ্চ সংস্থা আল-হাইয়াতুল উলয়া-লিল জামিয়াতিল কওমিয়া বাংলাদেশ এই শোকরানা মাহফিলের আয়োজন করে।

আলেমদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ‘কওমি জননী’ উপাধি দেন গোপালগঞ্জের গওহরডাঙ্গা মাদ্রাসার মহাপরিচালক কওমি শিক্ষা বোর্ড গওহরডাঙ্গার চেয়ারম্যান মুফতি রুহুল আমীন। তিনি ঘোষণায় বলেন, ‘আপনি ১৪ লাখ শিক্ষার্থীর জননীর ভূমিকা পালন করেছেন। আজকে আমি এই কওমি সমুদ্রে ঘোষণা করতে চাই, আজ থেকে আপনাকে ‘কওমি জননী’ উপাধি দিলাম’।

প্রধানমন্ত্রীর আরো দুটি পুরস্কার লাভ

জাতিসংঘের ৭৩তম অধিবেশন চলাকালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দুটি পুরস্কার প্রদান করা হয়। রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় প্রধানমন্ত্রীর গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বের জন্য গ্লোবাল নিউজ এজেন্সির ইন্টার প্রেস সার্ভিস (আইপিএস) তাঁকে অত্যন্ত মর্যাদাশীল ‘ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড’ প্রদান করে। এছাড়া গ্লোবাল হোপ কোয়ালিশন তাঁকে ২০১৮ ‘স্পেশাল রিকগনিশন ফর আউটস্ট্যান্ডিং লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড’ প্রদান করে।

২৭শে সেপ্টেম্বর সাধারণ পরিষদে ভাষণ দেবার পর আলাদা অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনার হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। ‘ইন্টারন্যাশনাল অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড’ ইতিপূর্বে জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান, বুট্রোস ঘালি এবং ফিনল্যান্ডের প্রেসিডেন্ট মাতি আহতিসারি পেয়েছেন।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীগণ

নারীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্মেলন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভেনশন সেন্টারে ১২ ও ১৩ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় 'ইনস্টিটিউট অব ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারস (আইইইই) উইমেন ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টারন্যাশনাল লিডারশিপ সামিট ২০১৮'। অনুষ্ঠানটির মূল প্রতিপাদ্য ছিল– স্বপ্ন, বিশ্বাস, অর্জন, ক্ষমতায়ন। এই বৈশ্বিক সম্মেলন আয়োজনের দায়িত্বে ছিল আইইইই উইমেন ইন ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাফিনিটি গ্রুপ অব বাংলাদেশ।

সম্মেলনে মূলত নারী উদ্যোক্তা, নারী সম্পর্কিত মেডিক্যাল গবেষণা, জাতীয় উন্নয়নে নারীর ভূমিকা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং প্রযুক্তির বিভিন্ন খাতে নারী উন্নয়নের বিষয়গুলোর প্রতি আলোকপাত করা হয়। এছাড়া মানবকল্যাণ বিষয়ক প্রযুক্তি উদ্ভাবনে নারী এবং ছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান করার জন্য উইমেন ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (ডব্লিউআইই) ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটারিয়ান টেকনোলজি প্রজেক্ট (আইএইচটিপি) নামের একটি প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে ১৩ জন বিদেশিসহ ৫৫ জন বক্তা, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, শ্রীলঙ্কার ৮ জনসহ ৩৩ জন প্রতিযোগী এবং তিন শতাধিক প্রতিনিধি, স্বেচ্ছাসেবী এবং গণমাধ্যমকর্মী অংশগ্রহণ করেন।

ইথিওপিয়ায় প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট

ইথিওপিয়ায় প্রথমবারের মতো একজন নারী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন। নাম সাহলে-ওয়র্ক জিউদা। ২৫শে অক্টোবর দেশটির আইনপ্রণেতারা সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করেন।

জিউদা মূলত একজন কূটনীতিক। প্রেসিডেন্ট হওয়ার আগে তিনি আফ্রিকান ইউনিয়নে জাতিসংঘের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেছেন। এরও আগে তিনি ফ্রান্স ও সেনেগালে রাষ্ট্রদূত হিসেবে কাজ করেছেন। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক সময়ে ইথিওপিয়া মন্ত্রী হিসেবে ২০ জন নারীকে নিয়োগ দিয়েছে, যা মোট মন্ত্রী সংখ্যার অর্ধেক।

মানবাধিকার পুরস্কার পেলেন আসমা জাহাঙ্গীর

জাতিসংঘের ২০১৮ সালের মানবাধিকার পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন পাকিস্তানের প্রয়াত মানবাধিকারকর্মী আসমা জাহাঙ্গীর। ২৬শে অক্টোবর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রেসিডেন্ট মারিয়া ফেরনান্দা এসপিনোসা গার্সেস তাঁর টুইটার অ্যাকাউন্টে এ ঘোষণার কথা জানান।

মোট তিনজন ব্যক্তি ও একটি সংগঠনকে এ বছর জাতিসংঘ মানবাধিকার পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। আগামী ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সদর দপ্তরে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে বিজয়ীদের হাতে এই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

কৃষি : বিশেষ প্রতিবেদন

ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ চতুর্থ

নানারকম সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূল পরিবেশের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এগিয়ে যাচ্ছেন দেশের ধান বিজ্ঞানীরা। তাদের নতুন নতুন উদ্ভাবন, কৃষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির সফল প্রয়োগের ফলে ধান উৎপাদনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে চতুর্থ। সম্প্রতি *ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর* পত্রিকায় প্রকাশিত এক নিবন্ধে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। নিবন্ধে বলা হয়েছে, অতীতের তীব্র খাদ্য ঘাটতির বাংলাদেশ বর্তমানে উদীয়মান অর্থনীতির নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। অতীতের তলাবিহীন ঝুড়ি এখন শক্ত ভিত্তির উদ্বৃত্ত খাদ্যের বাংলাদেশ।

বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ ২৫শে অক্টোবর ২০১৮ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে '6th BAPA Foodpro International Expo'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন–পিআইডি

আরো একটি পরিবেশবান্ধব সার কারখানা

দেশে আরো একটি পরিবেশবান্ধব সার কারখানা নির্মাণ করা হবে। এলক্ষ্যে শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু এবং বাংলাদেশে জাপানের রাষ্ট্রদূত হিরোয়াসু ইজুশির উপস্থিতিতে বিসিআইসি এবং নির্মাতা প্রতিষ্ঠান মিতসুবিশি হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড ও চায়না ন্যাশনাল কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নং-৭ কন্সট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেডের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

নরসিংদী জেলার পলাশে ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড (ইউএফএফএল) এবং পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লিমিটেড (পিইউএফএফএল)-এর স্থলে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির এ কারখানা গড়ে তোলা হবে। জ্বালানি সাশ্রয়ী, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন এবং পরিবেশবান্ধব সার কারখানা হবে এটি। বছরে এ কারখানা থেকে প্রায় ৯ লাখ ২৪ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া সার পাওয়া যাবে। উৎপাদন ক্ষমতার বিচারে এ কারখানায় উৎপাদন ক্ষমতা হবে বিদ্যমান সার কারখানা দুটির মোট উৎপাদনের প্রায় তিনগুণ।

কৃষিতে এগিয়ে যাচ্ছে দেশ

কৃষিতে ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। বিশ্বের মধ্যে ধান উৎপাদনে বাংলাদেশের অবস্থান এখন ৪র্থ, সবজি উৎপাদনে ৩য়, আলু উৎপাদনে ৮ম এবং আম উৎপাদনে ৭ম। কৃষিপণ্য রপ্তানিতে

সরকার ২০ শতাংশ হারে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। যার ফলে বাড়তে শুরু করেছে কৃষিপণ্যের রপ্তানি। গত বছরের তুলনায় গত তিন মাসে কৃষিপণ্যের রপ্তানি বেড়েছে ৯৭ দশমিক ৩১ শতাংশ। ২৫শে অক্টোবর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশ অ্যাগ্রো প্রসেসরস অ্যাসোসিয়েশন (বাপা) আয়োজিত তিনদিনব্যাপী '৬ষ্ঠ বাপা ফুডপ্রো ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো ২০১৮'-এর উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা জানান বাণিজ্যমন্ত্রী তোফায়েল আহমেদ।

৬ষ্ঠ বাপা ফুডপ্রো ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোতে বাংলাদেশ, ভারত, চীন, থাইল্যান্ড, কানাডা, মালয়েশিয়া, জার্মানি, আমেরিকা, পর্তুগাল, নেদারল্যান্ড, তাইওয়ান, সিঙ্গাপুরসহ ১৫টি দেশের ২৫৮টি স্টলে ১৮৮টি প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়।

প্রতিবেদন: এনায়েত হোসেন

১০৯ সামাজিক নিরাপত্তা : বিশেষ প্রতিবেদন

হাওর এলাকায় দরিদ্র নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি

হাওর এলাকার হতদরিদ্র নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করার জন্য 'হাওর এলাকার সুবিধাবঞ্চিত নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের জন্য আয় ও কর্মসংস্থান কর্মসূচি' গ্রহণ করেছে সরকার। ৭ই নভেম্বর মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মিলনায়তনে এ কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি ৭ই নভেম্বর হাওর এলাকার সুবিধাবঞ্চিত নারীদের কর্মসংস্থান কর্মসূচির উদ্‌বোধন করেন

প্রতিমন্ত্রী বলেন, হাওর এলাকার সুবিধাবঞ্চিত নারীদের আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নে ভাসমান বীজতলা ও বিষমুক্ত সবজি চাষ প্রশিক্ষণ, হাঁস প্রতিপালন প্রশিক্ষণ প্রদান করে নারী-পুরুষ বৈষম্যহীন পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নে এই কর্মসূচি ভূমিকা রাখবে। উল্লেখ্য, এই প্রকল্পটি ৪টি জেলার মোট ২৮টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২০ সাল পর্যন্ত।

পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ

পোশাক শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি ৫১ শতাংশ বাড়িয়ে ৮ হাজার টাকা নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে সরকার। ২৫শে নভেম্বর এ প্রজ্ঞাপন জারি হয়। এ মজুরি ১লা ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হবে।

প্রজ্ঞাপনে শ্রমিকদের জন্য সাতটি ও কর্মচারীদের জন্য চারটি গ্রেড নির্ধারণ করা হয়েছে। শ্রমিকদের সপ্তম গ্রেডে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে ৮ হাজার টাকা। পোশাক শিল্পের কর্মচারীদের চতুর্থ গ্রেডে ৮ হাজার ৩৭৫ টাকা ও প্রথম গ্রেডে ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪ হাজার ৭৫ টাকা। তবে সব গ্রেডেই মূল মজুরি ও বাড়ি ভাড়া ভাতা ছাড়াও ন্যূনতম মোট মজুরির মধ্যে ৬০০ টাকা চিকিৎসা ভাতা, ৩৫০ টাকা যাতায়াত ভাতা ও ৯০০ টাকা খাদ্য ভাতা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

প্রতিবেদন: মেজবাউল হক

পরিবেশ ও জলবায়ু : বিশেষ প্রতিবেদন

জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলায় বিভিন্ন উদ্যোগ

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে দেশে খাদ্য উৎপাদন ধীরে ধীরে কমে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। ২৩শে অক্টোবর জাতীয় সংসদে সরকারি দলের সংসদ সদস্য আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাসিমের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ আশঙ্কার কথা জানান। মন্ত্রী আরো জানান, সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা করে কৃষি উৎপাদনের চাকা সচল রাখতে বেশকিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। কৃষিমন্ত্রীর তথ্য মতে, সরকারের নেওয়া পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে– স্বল্প পানি ব্যবহার করে ফসল উৎপাদনের প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, জলমগ্নতা সহিষ্ণু ধানের আবাদ, ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বাড়ানো, কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে জৈব প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো, গম, ভুট্টা ও জল জাতীয় ফসলের আবাদ বাড়ানো, পরিকল্পিত শিল্পায়ন, মানুষের খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, জ্বালানি সাশ্রয়, নতুন শস্যবিন্যাস প্রবর্তন, ভাসমান সবজি ও মসলা উৎপাদন প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রভৃতি।

মতিয়া চৌধুরী বলেন, দেশে আউশ ও আমন চাষাবাদ, জমি পুনর্বিন্যাস, অনাবাদি জমি আবাদের আওতায় আনা এবং দেশি জাতের পরিবর্তে আধুনিক উচ্চ ফলনশীল ধানের আবাদ পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে চাল উৎপাদন বহুলাংশে বাড়ানো সম্ভব। কৃষি জমির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে ২০৩০ সাল নাগাদ ২৫ লাখ টন বাড়তি চাল উৎপাদন করা সম্ভব। মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মাধ্যমে এসব পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বলে মন্ত্রী জানান।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ প্রয়োজন

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা নিরূপণে বাংলাদেশের একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামো প্রয়োজন। যে কাঠামো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি পরিমাপ, ক্ষতিপূরণ ও নীতিনির্ধারণে সহযোগিতা করবে। ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন ও দাবি আদায়ে সহযোগিতা করবে এ কাঠামো।

২৯শে অক্টোবর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের যৌথ আয়োজনে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতি বিষয়ক একটি বহুপাক্ষিক আলোচনায় এসব কথা বলেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ, গবেষক ও সরকারি কর্মকর্তারা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সত্য ব্রত সাহা বলেন, জাতিসংঘের কয়েকটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০০৫ থেকে ২০৫০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ক্ষতির পরিমাণ হতে পারে প্রায় ১২১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বাংলাদেশের জিডিপির ৫ শতাংশ। এ ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিস্তারিত জানা, পরিমাপ করা, বোঝা এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি কাঠামো প্রয়োজন।

অ্যাকশন এইড বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন বিভাগের প্রধান তানজির হোসেন বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে একজন সাধারণ মানুষের আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক কী সমস্যা হচ্ছে তা নিরূপণ করা দরকার। সে কারণে সাধারণ মানুষকে যুক্ত করে তাদের ধারণা, অভিজ্ঞতা ও মূল্যায়নের আলোকে একটি কমিউনিটিভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ কাঠামো তৈরি করতে হবে।

প্রতিবেদন: রিপা আহমেদ

নিরাপদ সড়ক : বিশেষ প্রতিবেদন

জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০১৮

আইন মেনে চলব, নিরাপদ সড়ক গড়ব– প্রতিপাদ্য নিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো ২২শে অক্টোবর সারাদেশে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস ২০১৮ পালিত হয়। জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও যোগাযোগমন্ত্রী আলাদা আলাদাভাবে বাণী দেন। রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ তাঁর বাণীতে বলেন, টেকসই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নে উন্নত পরিবহণ সেবার বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে সরকার দেশব্যাপী ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-ময়মনসিংহ হাইওয়েকে ফোর লেনে উন্নীত করা হয়েছে। বাস্তবায়িত হচ্ছে ঢাকা এক্সপ্রেস এলিভেটেড হাইওয়ে, মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিটের মতো মেগা প্রকল্প। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর বাণীতে বলেন, আমরা বিগত সাড়ে ৯ বছরে দেশের উন্নত সড়ক, যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণে ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছি। বিভিন্ন মহাসড়ক চার লেনে উন্নীত করা হয়েছে। নতুন নতুন রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট, ফ্লাইওভার ও ওভারপাস নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ ও মেরামত করা হয়েছে। টেকসই, নিরাপদ ও মানসম্মত সড়ক অবকাঠামো এবং সমন্বিত আধুনিক গণপরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এ উপলক্ষে সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেন, উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির মধ্য দিয়ে বাড়ছে দেশের সড়ক নেটওয়ার্ক। সেই সাথে বাড়ছে মোটরযানের সংখ্যা ও এর ব্যবহার। সড়ক পরিবহণ খাতে ক্রমবর্ধমান উন্নতির সাথে সাথে সড়ক দুর্ঘটনা একটি জাতীয় সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। নিরাপদ সড়ক সবারই প্রত্যাশা। এ প্রত্যাশা পূরণে সরকার নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

বদলে যাবে ঢাকার ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা

ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনের ৮৮টি সড়ক মোড়ের মধ্যে ৬২টি ইন্টারসেকশনকে রিমোট কন্ট্রোল অটোমেটিক বৈদ্যুতিক সিগন্যালের আওতায় আনা হবে। যন্ত্রের মাধ্যমে সময় নির্ধারণ করে রিমোট কন্ট্রোল ব্যবস্থায় ট্রাফিক পুলিশ বক্স থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে। সে কারণে রিমোট সিস্টেমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ডায়াগ্রামে পরিবর্তন আনা হচ্ছে। এজন্য ভারত থেকে আনা হয়েছে দক্ষ ইঞ্জিনিয়ারিং টিম। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন (ডিএসসিসি) সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে। প্রাথমিক অবস্থায় এ পদ্ধতির আওতায় নির্ধারণ করা হয়েছে যেসব জায়গা সেগুলো হলো বাংলামোটর, হোটেল ইন্টারকন্টিনজেন্টাল মোড়, শাহবাগ, মৎস্য ভবন মোড়, কার্জন হলের সামনে, কদম ফোয়ারা ও কাকরাইল মসজিদের সামনের মোড়। এ প্রকল্পের জন্য বিদেশ থেকে ইতোমধ্যেই ২৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৩৪টি রিমোট আনা হয়েছে।

প্রতিবেদন: মো. সৈয়দ হোসেন

যোগাযোগ : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা–কালিয়াকৈর চলবে শাটল ট্রেন

ঢাকা থেকে কালিয়াকৈরের হাইটেক পার্ক পর্যন্ত চলবে শাটল ট্রেন। কালিয়াকৈরে দেশের প্রথম হাইটেক পার্কের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে এ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই রেলপথের দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ৫৭ কিলোমিটার। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ১৬১ কোটি টাকা। প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৯ থেকে জুন ২০২২ মেয়াদে বাস্তবায়ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের ওপর যানবাহনের বাড়তি চাপ ও যানজট দূর করা সম্ভব হবে।

ঢাকা-পঞ্চগড় ট্রেনের যাত্রা শুরু

নানা আয়োজন আর উৎসবের আমেজে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত

ঢাকা-পঞ্চগড় সরাসরি আন্তঃনগর ট্রেন

পঞ্চগড়-ঢাকা-পঞ্চগড় সরাসরি আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিস উদ্‌বোধন করা হয়েছে। ১০ই নভেম্বর সকালে পঞ্চগড় রেলস্টেশন চত্বরে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. আবুল কালাম আজাদ আন্তঃনগর দ্রুতযান ট্রেনের যাত্রা উদ্‌বোধন করেন। এই রেলপথটি দেশের সর্বোচ্চ দূরত্বের ট্রেন সার্ভিস। ঢাকা থেকে যার দূরত্ব ৬৩৯ কিলোমিটার। এই ট্রেন চলাচলের মধ্য দিয়ে পঞ্চগড়ের মানুষের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন পূরণ হলো।

পঞ্চগড়বাসীর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় ব্যাপক উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে সহস্রাধিক উচ্ছ্বসিত মানুষ এই উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এর আগে ঢাকা-দিনাজপুর রেলপথে দ্রুতযান এবং একতা ট্রেনকে নিয়ে আসা হয়েছে পঞ্চগড় পর্যন্ত। পঞ্চগড় থেকে ঢাকা পৌঁছানোর মাঝে এই ট্রেন থামবে ২৩টি স্টেশনে। ট্রেন দুটি পঞ্চগড়-দিনাজপুরের মধ্যে নতুন সময়সূচি অনুযায়ী চলাচল করবে। এছাড়া থাকছে না কোনো সাপ্তাহিক বন্ধের দিন। দ্রুতযান ও একতা এক্সপ্রেস ট্রেনের বগি সংখ্যা মোট ১৩টি। একেকটি ট্রেন প্রায় ১ হাজার ২০০ যাত্রী বহন করতে পারবে।

উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আবুল কালাম আজাদ বলেন, প্রতিটি জেলা শহর থেকে রেলপথ উন্নয়নে বর্তমান সরকারের নেওয়া পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পঞ্চগড়-ঢাকা রেলপথে আন্তঃনগর ট্রেন সার্ভিস চালু করা হলো। সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী পঞ্চগড়-বাংলাবান্দা রেলপথ নির্মাণ করা হবে। ইতোমধ্যে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। আগামী ১ বছরের মধ্যে এটি দৃশ্যমান হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

গোপালগঞ্জে পরীক্ষামূলক নতুন রেলপথ চালু

গোপালগঞ্জে ৪৪ কিলোমিটার নতুন রেলপথে পরীক্ষামূলক ট্রেন চালানো হয়েছে। এ রেলপথ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় সেতু, কালভার্ট, রেলগেট, রেলক্রসিং, স্টেশন, ট্রেন চলাচলের সিগন্যালসহ সবকিছু প্রস্তুত করা হয়েছে। রেললাইনটি ট্রেন চলাচলের উপযোগী হওয়ায় যে-কোনো সময় এটি সবার চলাচলের জন্য উদ্‌বোধন করা হবে। জেলার কাশিয়ানী থেকে গোবরা পর্যন্ত ৪৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এ রেলপথ গোপালগঞ্জ থেকে রাজশাহী পর্যন্ত সরাসরি মেইল ট্রেন চলাচল করবে। ২০১৫ সালে শুরু হওয়া এ রেললাইন নির্মাণে 'ম্যাক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড' ও 'তমা কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড কোম্পানী লিমিটেড' ঠিকাদারির দায়িত্বে ছিল। জুলাই ২০১৮-এ রেলপথ স্থাপনের কাজ শেষ হয়। এ প্রকল্পে ১ হাজার ২৫৮ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। দীর্ঘকাল অপেক্ষার পর গোপালগঞ্জে নতুন রেলপথে রেল চালুর খবরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে স্থানীয়রা। এই রেললাইন চালুর ফলে জেলার আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে। যানজটের কবলে পড়তে হবে না। শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে।

প্রতিবেদন: জাহিদ হোসেন নিপু

মাদক প্রতিরোধ : বিশেষ প্রতিবেদন

মাদক নিয়ন্ত্রণ আইন পাস

বর্তমান সরকারের শেষ অধিবেশনে অর্থাৎ ২৩তম অধিবেশনে পাস হওয়া নয়টি বিলে সম্মতি জানিয়ে স্বাক্ষর করেছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ। এসব বিলের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বিল-২০১৮। রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে বিলটি আইনে পরিণত হলো। এখন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে এই আইন কার্যকর ভূমিকা রাখবে। সদ্য পাস হওয়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ইয়াবা (অ্যামফিটমিন), কোকেন, হেরোইন পরিবহণ, কেনাবেচা, ব্যবসা, সংরক্ষণ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, হস্তান্তর, সরবরাহ ইত্যাদি অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবনের বিধান রাখা হয়েছে।

অবশ্য বহনের পরিমাণ অনুযায়ী সাজা কম-বেশি হতে পারে। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ আইনের অধীন অপরাধ সংগঠনে অর্থ বিনিয়োগ, সরবরাহ, মদদ ও পৃষ্ঠপোষকতা দিলেও একই ধরনের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে অর্থলগ্নি, পৃষ্ঠপোষকতা, মদদদাতা সবাইকে শাস্তির আওতায় আনা যাবে। এতদিন মাদকের মাস্টারমাইন বা গডফাদাররা বিচারের বাইরে থেকে যেত। বর্তমান আইনে সেই সুযোগ বন্ধ করা হয়েছে।

মাদকবিরোধী জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম গৃহীত

মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণে জনসচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে অক্টোবর মাসে মাদকবিরোধী অভিযান, প্রচার, কার্যক্রম ও মাঠপর্যায়ে মাদকবিরোধী ফিলার প্রচার করে।

এসময় ঢাকা বিভাগে মাদকবিরোধী সভা হয় ৫৯টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক মাদকবিরোধী আলোচনা সভা ৭৫টি ও

মাদকবিরোধী ফিলার প্রচারে স্থানের সংখ্যা ১৩টি, ময়মনসিংহে মাদকবিরোধী সভা ২০টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আলোচনা সভা ১১টি, মাদকবিরোধী ফিলার প্রচারে স্থানের সংখ্যা ১০টি, চট্টগ্রামে মাদকবিরোধী সভা ৩৮টি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক আলোচনা সভা ৭২টি, মাদকবিরোধী ফিলার প্রচারে স্থানের সংখ্যা ১২টি, রাজশাহীতে মাদকবিরোধী সভা ২৬টি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক আলোচনা সভা ৩৯টি, মাদকবিরোধী ফিলার প্রচারে স্থানের সংখ্যা ২৮টি, রংপুরে মাদকবিরোধী সভা ১৬টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আলোচনা সভা ২১টি, মাদকবিরোধী ফিলার প্রচারে স্থানের সংখ্যা ১১টি, খুলনায় মাদকবিরোধী সভা ৪৪টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আলোচনা সভা ৩২টি, মাদকবিরোধী ফিলার প্রচারে স্থানের সংখ্যা ১৪টি, বরিশালে মাদকবিরোধী সভা ১১টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আলোচনা সভা ৩২টি, মাদকবিরোধী ফিলার প্রচারে স্থানের সংখ্যা ৩৬টি এবং সিলেটে মাদকবিরোধী সভা ২৩টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আলোচনা সভা ২৫টি, মাদকবিরোধী ফিলার প্রচারে স্থানের সংখ্যা ৯টি, অক্টোবর মাসে আটটি বিভাগে মাদকবিরোধী সভা হয়েছে ২৩৭টি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানভিত্তিক আলোচনা সভা হয়েছে ৩০৭টি ও মাদকবিরোধী ফিলার প্রচার হয়েছে ১২২টি।

এছাড়া, অক্টোবর মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর অভিযান পরিচালনা করেছে ৪ হাজার ৮৪৩টি, মামলা করেছে ১ হাজার ১৭৪টি এবং আসামি আটক করেছে ১ হাজার ২৭৩ জন। অভিযানকালে বিভিন্ন মাদকদ্রব্য আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।

প্রতিবেদন: জান্নাত হোসেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৪শে অক্টোবর নবনির্মিত 'শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট'-এর মডেল প্রত্যক্ষ করেন–পিআইডি

স্বাস্থ্যকথা : বিশেষ প্রতিবেদন

শেখ হাসিনা বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের যাত্রা শুরু

শেখ হাসিনা বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের যাত্রা শুরু হয়েছে। ২৪শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চানখারপুল এলাকায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পাশে নির্মিত এ ইনস্টিটিউটের উদ্‌বোধন করেন।

প্রধানমন্ত্রীর নামে প্রতিষ্ঠিত এই ইনস্টিটিউটটিই দেশের প্রথম বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট। যেখানে একসঙ্গে পাঁচ শতাধিক পোড়া রোগীকে চিকিৎসা দেওয়া যাবে। ১২তলা এ ভবনে ৫০০ শয্যা, ৫০টি নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র (আইসিইউ) এবং ১২টি অপারেশন থিয়েটার রয়েছে। ইনস্টিটিউটের তিনটি ব্লকে থাকবে বার্ন ইউনিট, প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট এবং অ্যাকাডেমিক ভবন। সারাদেশের কয়েক লাখ পোড়া রোগীকে সেবা দিতে দেড় হাজার বিশেষজ্ঞ সার্জন তৈরির লক্ষ্য নিয়েই এই ইনস্টিটিউট চালু হলো।

সংক্রামক ব্যাধি গোপন রাখলে শাস্তি

সংক্রামক ব্যাধির কথা গোপন রাখার পর এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মাধ্যমে রোগের বিস্তার ঘটলে ওই ব্যক্তিকে ছয় মাসের কারাদণ্ড বা এক লাখ টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ডের বিধান রেখে 'সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) বিল ২০১৮' জাতীয় সংসদে ২৫শে অক্টোবর পাস হয়েছে।

প্রস্তাবিত আইনে বলা হয়েছে, সংক্রমিত ব্যক্তি রোগ সম্পর্কে জানার পরও মিথ্যা বা ভুল তথ্য দিলে সর্বোচ্চ দুই মাস কারাদণ্ড বা সর্বোচ্চ ২৫ হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় দণ্ড দেওয়া হবে।

প্রস্তাবিত আইনে ২৩টি সংক্রামক রোগের নাম উল্লেখ করা হয়েছে– ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, ডেঙ্গু, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিপাহ, অ্যানথ্রাক্স, জলাতঙ্ক, ডায়রিয়া, যক্ষ্মা, শ্বাসনালির সংক্রমণ, এইচআইভি, ভাইরাল হেপাটাইটিস, টাইফয়েড, খাদ্যে বিষক্রিয়া, ইবোলা, জিকা, চিকনগুনিয়া, এভিয়ান ফ্লু, ফাইলেরিয়াসিস, মেনিনজাইটিস জাপানিজ এনকেফালাইটিস ইত্যাদি।

মানসিক অসুস্থতার জাল সনদ দিলে জেল-জরিমানা

মানসিক অসুস্থতার জাল সনদ দিলে জেল-জরিমানার বিধান রেখে জাতীয় সংসদে 'মানসিক স্বাস্থ্য বিল ২০১৮' পাস হয়েছে। ২৫শে অক্টোবর স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন।

বিলে বলা হয়েছে, মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় পেশাজীবী হিসেবে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে মিথ্যা সনদ দিলে তিন লাখ টাকা জরিমানা, এক বছর কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। এছাড়া সরকারি অনুমোদন ছাড়া মানসিক হাসপাতাল চালালে সর্বোচ্চ পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা এবং একই অপরাধের পুনরাবৃত্তি হলে ২০ লাখ টাকা জরিমানার বিধান রাখা হয়েছে।

সোরিয়াসিস কোনো ছোঁয়াচে রোগ নয়

সোরিয়াসিস রোগ সংক্রামক বা ছোঁয়াচে নয়। এই চর্মরোগ অনেকটাই বংশগত। এই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের কেউ যেন

অবহেলার শিকার না হয় সেজন্য সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি দরকার। সম্প্রতি রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে সোরিয়াসিস রোগ নিয়ে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। সেমিনারের আয়োজন করে সোরিয়াসিস অ্যাওয়ারনেস ক্লাব।

সেমিনারে ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অব ডার্মাটোলজির ভাইস প্রেসিডেন্ট কৌশিক লাহিড়ী বলেন, সোরিয়াসিস রোগ একবার হয়ে গেলে তা আর সারে না। তবে এ রোগ সংক্রামক নয়। নিয়মিত চিকিৎসা নিলে এই রোগ নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব এবং সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনযাপন করা সম্ভব।

ভ্রূণ হত্যা বন্ধে জিরো টলারেন্সে সরকার

ভ্রূণ হত্যা বন্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে সরকার। সম্প্রতি এ সংক্রান্ত ঘটনায় দায়েরকৃত মামলা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। তদন্তে গড়িমসি করলে বা গড়িমসি করার সঙ্গে জড়িত থাকার প্রমাণ মিললে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রতিবেদন: মো. আশরাফ উদ্দিন

প্রতিবন্ধী : বিশেষ প্রতিবেদন

শুধু সাক্ষাৎকারেই প্রতিবন্ধীদের কর্মসংস্থান

শুধু সাক্ষাৎকার দিয়ে যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি পাচ্ছেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা। প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে কাজের সুযোগ করে দিতে দুদিনের (১৪-১৫ই নভেম্বর) চাকরি মেলার আয়োজন করা হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রতিবন্ধী চাকরি মেলা সকাল ১০টা থেকে শুরু হয়ে বিকাল ৫টা পর্যন্ত চলে। মেলায় আগত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে যোগ্যতার ভিত্তিতে উপযুক্ত চাকরি প্রদানের উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন বেসরকারি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণ মেলায় অংশগ্রহণ করেছেন। উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানে সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দুই দিনব্যাপী চাকরি মেলায় প্রতিবন্ধীদের যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি দেওয়া হয়। প্রতিবন্ধীরা বোঝা নয়, যোগ্যতা অনুযায়ী গড়ে তোলা গেলে তারাও দেশের সম্পদ। এজন্য বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পরই প্রতিবন্ধীদের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের অংশ হিসেবে মেলা আয়োজন করে সারাদেশের প্রতিবন্ধীদের খুঁজে খুঁজে এনে চাকরি দেওয়া হয়।

চাকরি মেলায় নিবন্ধনে ব্যস্ত প্রতিবন্ধীরা

প্রতিবন্ধীদের জন্য সফটওয়্যার বানাবে সরকার

বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের দৈনন্দিন ও প্রাতিষ্ঠানিক কাজে যোগাযোগের উপযোগী সফটওয়্যার তৈরি করছে আইসিটি বিভাগ। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার ১৮ই নভেম্বর ২০১৮ ঢাকার জনতা টাওয়ার সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্কে 'প্রতিবন্ধীদের জন্য সফটওয়্যার উন্নয়ন' বিষয়ক কর্মশালায় এ কথা জানান। তিনি বলেন, ভিন্নভাবে সক্ষম মানুষের প্রতিবন্ধিতা দূর করতে বাংলা ভাষাভিত্তিক যোগাযোগের এই সফটওয়্যার তৈরি করা হচ্ছে। যাদের দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক, কিন্তু বলতে বা শুনতে পারে না, তারা এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে উপকৃত হবে বলে তিনি জানান।

কর্মশালায় 'গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো. জিয়া উদ্দিন বলেন, 'এ ধরনের সফটওয়্যার তৈরির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সাইন ল্যাংগুয়েজ, মুখভঙ্গি বা জেসচারকে ইউনিকোড টেক্সটে রূপান্তর করা এবং তা থেকে অটোমেটিক স্পিচ জেনারেট করা'।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা একটি মোবাইল ফোনের ক্যামেরার সামনে হাত, হাতের আঙুল ও মুখমণ্ডলের নড়াচড়ার মাধ্যমে বাংলা সাইন ল্যাংগুয়েজ দেখাবেন। মোবাইলের অ্যাপ সেই 'ইশারা ভাষা' শনাক্ত করে তাকে বাংলা ইউনিকোড টেক্সটে রূপান্তর করে অন্য প্রান্তে দেখাবে। পাশাপাশি ওই টেক্সট বাংলা কথায় রূপান্তরিত হবে।

'গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় এ সফটওয়্যার তৈরি হবে। এই সফটওয়্যারের নাম হবে 'আটোমেটিক রিয়েল টাইম বাংলা সাইন-জেসচার ডিটেকশন অ্যাপ টেক্সট-স্পিচ জেনারেশন সিস্টেম'। এই সফটওয়্যার নির্দিষ্ট কোনো ডিভাইসের ওপর নির্ভরশীল হবে না। সাধারণ অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল বা সম পর্যায়ের ডিভাইসেই তা কাজ করবে। ইশারা ভাষা নির্ণয়ে মোশন ইমেজ প্রসেসিং পদ্ধতির সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, বিশেষ করে মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে এই সফটওয়্যারে।

একজন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি তার

দৈনন্দিন ও প্রতিষ্ঠানিক কাজে যতগুলো পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে থাকেন এর প্রায় সবগুলোই এই সফটওয়্যারে সন্নিবেশিত থাকবে। যেমন, চিকিৎসা সেবা গ্রহণ ও রোগের বর্ণনা, পুলিশের কাছে আইনি সহায়তা ও পরিস্থিতি বর্ণনা, ক্লাসরুম, রেস্তোরাঁ, দোকান, এয়ারপোর্ট, বিনোদন কেন্দ্র, পরিবারিক আলাপচারিতা, কুল জিজ্ঞাসা ইত্যাদি পরিস্থিতি থেকে 'সাইন টু টেক্সট অ্যান্ড স্পিচ' তৈরি করতে পারবে এই সফটওয়্যার।

১৯৯৪ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ জাতীয় বধির সংস্থার যৌথ উদ্যোগে প্রকাশ করা হয় বাংলা ইশারা ভাষার অভিধান। এরপর ২০০৯ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বাংলা ইশারা ভাষার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতির পরিপত্র জারি করে।

প্রতিবেদন: হাছিনা আক্তার

শিশু ও কিশোর উন্নয়ন : বিশেষ প্রতিবেদন

শিশু-কিশোর প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

জাতীয় শিশু-কিশোর প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা ২০১৮-এর বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার। রাজধানীর আইসিটি টাওয়ারে ৩০শে অক্টোবর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, তোমরা নতুন পথ তৈরি করে দিয়েছ, তোমাদের দেখানো পথেই নতুন প্রজন্ম হাঁটবে।

শিশুদের তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় আগ্রহী করতে চলতি বছরের মার্চ থেকে সারাদেশে ১৮০টি স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিশু-কিশোর প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করে কম্পিউটার কাউন্সিল ও ইয়াং বাংলা। প্রায় ৫ হাজার শিক্ষার্থী এতে অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন বিভাগে বিজয়ীদের মধ্যে ট্যাব, ল্যাপটপ, সার্টিফিকেট, বই ও ক্রেস্ট বিতরণ করা হয়।

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দুটি বিভাগে প্রতিযোগিতা হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের আবার ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত জুনিয়র এবং ৯ম ও ১০ম শ্রেণিকে সিনিয়র বিভাগে ভাগ করা হয়। এই তিন বিভাগের প্রতিটিতে চ্যাম্পিয়ন, প্রথম রানার আপ, দ্বিতীয় রানার আপ এবং আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্স হিসেবে পুরস্কার দেওয়া হয়।

সিনিয়র বিভাগে ঢাকার বিসিআইসি কলেজের আরমান ফেরদৌস এবং জুনিয়র বিভাগে লালমনিরহাটের বত্রিশ হাজারী উচ্চ বিদ্যালয়ের মো. রাব্বি হোসেন চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। জুনিয়র (প্রাথমিক) বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মানিকগঞ্জের মেহজাবিন বুশরা, অনন্য জারিফ ও রোদেলা ইসলাম।

শিশুর যত্নে সচেতনতা জরুরি

দেশে প্রতিবছর ৬ লাখের বেশি অকালিক বা প্রিটার্ম শিশুর জন্ম হয়। সময়ের আগে জন্ম নেওয়া এসব নবজাতকের মধ্যে মৃত্যুহারও খুব বেশি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এসব শিশুর জীবন বাঁচাতে মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি এদের যত্নে পরিবার ও কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করতে হবে।

৮ই নভেম্বর রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলোর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত 'কম জন্ম-ওজন ও অসুস্থ নবজাতকের যত্নে পরিবারকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করি' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বিশেষজ্ঞরা এসব কথা বলেন। ১৭ই নভেম্বর বিশ্ব অকালিক শিশু দিবস উপলক্ষে জাতিসংঘ শিশু তহবিলের (ইউনিসেফ) সহযোগিতায় *প্রথম আলো* এই গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ বলেন, ২০৩০ সালের আগেই মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হ্রাসে বাংলাদেশ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারবে। সময়ের আগে কেন শিশুর জন্ম হচ্ছে, সেসব কারণ খুঁজে বের করে প্রতিরোধের উদ্যোগ নিতে হবে।

অনুষ্ঠানে বলা হয়, গর্ভধারণের পর ৩৭ সপ্তাহ পূর্ণ হওয়ার আগে জন্মালে সে অকালিক শিশু। এসব শিশু সাধারণত কম ওজন নিয়ে জন্মায়। জন্মের সময় ওজন ২ হাজার ৫০০ গ্রামের কম হলে তা কম জন্ম-ওজন। এদের মৃত্যু ঝুঁকি সাধারণ শিশুদের চেয়ে অনেক বেশি।

উল্লেখ্য, সারাদেশে ১৩ হাজারের বেশি কমিউনিটি ক্লিনিক এ বিষয়ে চিকিৎসা ও মানুষকে সচেতন করতে কাজ করছে। পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগীরা একসঙ্গে কাজ করলে দ্রুত অকালিক শিশুমৃত্যু কমানো সম্ভব।

প্রতিবেদন: নাসিমা খাতুন

ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী: বিশেষ প্রতিবেদন

গারোদের ওয়ানগালা উৎসব পালিত

ওয়ানগালা উৎসব বাংলাদেশের গারো নৃগোষ্ঠী সম্প্রদায়ের লোকদের প্রধান ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব। এটি 'ওয়ান্না' নামেও পরিচিত। প্রতিবছর সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর মাসে গারো পাহাড়ে এই উৎসব পালিত হয়। প্রতিবছর কার্তিক মাসের শেষ দিকে নতুন ফসল তুলে বিভিন্ন আয়োজনে তারা এ উৎসব পালন করে থাকে। ফসল তোলার এই উৎসবে সূর্যদেবতা ও দেবী মিসি-এর সালজং-এর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। উৎসবটি শীতকালের প্রারম্ভ নির্দেশ করে এবং রীতি অনুযায়ী এ বছরও ওয়ানগালা ২০১৮ গারো সম্প্রদায়ের লোকেরা পালন করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নানা ধর্মীয় প্রচারের মধ্য দিয়ে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৯ই নভেম্বর গারো সম্প্রদায়ের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। গারো সম্প্রদায় নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ করে যুগ যুগ ধরে শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে আসছে। প্রধানমন্ত্রী ওয়ানগালা উৎসব ২০১৮-এর সার্বিক সাফল্য করেন। আগামী বছর যেন ভালো ফসল হয়, সন্তানসন্ততি যেন ভালো থাকে আর দেশের মঙ্গল হয় এই কামনায় অনুষ্ঠিত হয় এবারের ওয়ানগালা উৎসব।

শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স উদ্‌বোধন

২৮শে অক্টোবর ঢাকার বেইলী রোডে ১৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে পার্বত্য ঐতিহ্যমণ্ডিত 'শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স' ভবনের উদ্‌বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উক্ত কমপ্লেক্সে রয়েছে একটি মাল্টিপারপাস হল, ডরমিটরি, প্রশাসনিক ভবন, মিউজিয়াম, লাইব্রেরি ইত্যাদি ছাড়াও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী ও পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যানের বাসভবন নির্মাণ করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষের সাথে সমতলের মানুষের

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৮শে অক্টোবর বেইলি রোডে শেখ হাসিনা পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স-এর উদ্‌বোধন করেন–পিআইডি

পারস্পরিক সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, সহযোগিতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলবন্ধন তৈরিতে কমপ্লেক্সটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। তাছাড়া স্থাপনাটি পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, সামাজিক রীতিনীতি, ভাষা, ধর্ম এবং আচরণ সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষকে পরিচিত করে তুলবে। কমপ্লেক্সটি পর্যটকদের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির সমন্বয়ে একটি দৃষ্টিনন্দন শৈল্পিক স্থাপনা হিসেবেও বিবেচিত হবে।

প্রতিবেদন: আছাব আহমেদ

সংস্কৃতি : বিশেষ প্রতিবেদন

ঢাকা আন্তর্জাতিক লোক উৎসব

খোলা ময়দানে গান শুনে মাঝরাতে বাড়ি ফেরার দিন ফিরে এল। কারণ হচ্ছে 'ঢাকা আন্তর্জাতিক লোক উৎসব-২০১৮'। ১৫ই নভেম্বর বনানীর বাংলাদেশ আর্মি স্টেডিয়ামে বসে সেই সুরের মিলনমেলা। সান ফাউন্ডেশন আয়োজিত আন্তর্জাতিক লোকগানের

উৎসবের জমকালো উদ্‌বোধন করেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত। এসময় উপস্থিত ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূরসহ আরো অনেকে। টানা ছয় ঘণ্টার আসরে দেশ-বিদেশের সাধারণ মানুষের যাপিত জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনা ও চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ডিজিটাল যন্ত্রের দাপটের যুগে লোকসংগীতের প্রতি তরুণদের আগ্রহ কমেনি, বরং দিন দিন বাড়ছে। উৎসবের উদ্‌বোধনীতে সংস্কৃতিমন্ত্রী তারুণ্যের স্রোত দেখে অভিভূত। তিন দিনের এ আয়োজন শেষ হয় ১৭ই নভেম্বর।

পঞ্চাশ পেরিয়ে উদীচী

উদীচীর পথচলা শুরু ১৯৬৮ সালের ২৯শে অক্টোবর। ৫০ বছর ধরে উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী হেঁটেছে গ্রামেগঞ্জে, শহরে-বন্দরে এমনকি দেশের বাইরে। ৫০ বছরের পথচলাকে উদ্‌যাপন করতে উদীচী ২০১৭ সালের ২৯শে অক্টোবর থেকে বছরব্যাপী কর্মসূচি শুরু করে। ২৭শে অক্টোবর শুরু হয় তিন দিনের সমাপনী পর্ব। কেন্দ্রীয় শহিদ-মিনারে এই সমাপন অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করেন উদীচীর সাবেক তিনজন সভাপতি অধ্যাপক পান্না কায়সার, সৈয়দ হাসান ইমাম ও কামাল লোহানী। এ সময় ৫০টি পায়রা উড়িয়ে দেন অতিথিরা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতিমন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, উদীচীর উপদেষ্টা কমরেড মনজুরুল আহসান খানসহ কয়েকজন গুণী ব্যক্তি।

বাংলাদেশ ও ভারতের শিল্পীদের প্রদর্শনী শিল্পকলায় বাংলাদেশ ও ভারতের প্রথিতযশা ২৬ জন শিল্পীর চিত্রকর্ম নিয়ে শিল্পকলা একাডেমিতে ১০ই নভেম্বর শুরু হয় ১২ দিনের যৌথ প্রদর্শনী। বাংলাদেশের ১৩ জন ও ভারতের ১৩ জন খ্যাতিমান শিল্পীর চিত্রকর্ম দিয়ে সাজানো হয় এ প্রদর্শনী।

১০ই নভেম্বর একাডেমির জাতীয় চিত্রশালায় 'কনটেম্পরারি আর্ট অব বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া' শীর্ষক এ প্রদর্শনীর উদ্‌বোধন করেন শিল্পী আব্দুশ শাকুর শাহ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার। প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত উন্মুক্ত থাকে এ প্রদর্শনী গ্যালারি। ২১শে নভেম্বর শেষ হয় এ প্রদর্শনী।

হুমায়ূন আহমেদ স্মরণে একক বইমেলা

কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের ৭০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশকদের আয়োজনে প্রথমবারের মতো গণগ্রন্থাগার প্রাঙ্গণে আয়োজন করা হয় একক বইমেলা। যার ফলে ১৩ই নভেম্বর থেকে শুরু হয় সপ্তাহব্যাপী বইমেলা। মেলার উদ্‌বোধন করেন কথাসাহিত্যিক অধ্যাপক সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন হুমায়ূন আহমদের ছোটোভাই আহসান হাবীব ও স্ত্রী মেহের আফরোজ শাওন। মেলায় ১৭টি প্রকাশনা সংস্থা অংশ নেয়। মেলা চলে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত।

প্রতিবেদন: তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

চলচ্চিত্র : বিশেষ প্রতিবেদন

এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বাংলাদেশের ৩ চলচ্চিত্র

বার্সেলোনায় অনুষ্ঠিত হয় 'এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'। স্পেনের এশিয়ান ভিত্তিক সংগঠন কাসা এশিয়া'র এই আয়োজন চলে ৩১শে অক্টোবর থেকে ১১ই নভেম্বর পর্যন্ত। এই উৎসবে বাংলাদেশের ৩টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। চলচ্চিত্রগুলো হলো– আরেফিন খান পরিচালিত 'ভুবন মাঝি', এ কে রেজা গালিব পরিচালিত 'কালের পুতুল' ও মোস্তফা

সারোয়ার ফারুকী পরিচালিত 'ডুব'। এবারের আসরে এশিয়ার ২৩ দেশ থেকে প্রায় ৫ শতাধিক চলচ্চিত্র জমা পড়ে। সেখান থেকে সাম্প্রতিক সময়ে মুক্তি পাওয়া ১০০টি সিনেমা বাছাই করে দ্য এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের জন্য মনোনীত করা হয়। এ উৎসবের সিনেমাগুলো পৃথক পৃথক ৩টি ভেন্যুতে দেখানো হয়। এ উৎসবে বাংলাদেশসহ আফগানিস্তান, ভুটান, চায়না, হংকং, মালয়েশিয়া, কোরিয়া, ভারত, পাকিস্তান, মঙ্গোলিয়া, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ডসহ ২৩টি দেশের চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

দিল্লিতে সেরা 'ভয়'

দিল্লি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ২০১৮ তে 'বেস্ট শর্ট ফিল্ম অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছে বাংলাদেশের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'ভয়– দ্য ফিয়ার অব সাইলেন্স'। ২২ মিনিটের এ ছবিটি পরিচালনা করেন জুয়েইরিয়াহ মউ। নবারুণ ভট্টাচার্যের 'মৃতদেহ দর্শন' গল্পের ছায়া অবলম্বনে এবং বাংলাদেশ সরকারের বিসিটিআই-এর অর্থায়নে নির্মিত হয় এই ছবিটি। এক্সিকিউটিভ প্রডিউসার মিতুল আহমেদ।

তারুণ্যলোকের টেলিফিল্ম 'মেঘের ক্যানভাস'

একজন চিত্রশিল্পীকে কেন্দ্র করে ত্রিভুজ প্রেমের গল্প নিয়ে নির্মিত তারুণ্যলোকের প্রথম টেলিফিল্ম *মেঘের ক্যানভাস*। সৌরভ বোস প্রযোজিত এ টেলিফিল্মটির গল্প ও চিত্রনাট্য দয়াল সাহা ও ফরিদ উদ্দিন মোহাম্মদের। মাহতাব শফি ও ফায়সাল তনুর সার্বিক তত্ত্বাবধানে টেলিফিল্মটি নির্মাণ করেছেন ফরিদ উদ্দিন মোহাম্মদ।

প্রতিবেদন: মিতা খান

ক্রীড়া : বিশেষ প্রতিবেদন

পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ

সাফ অনূর্ধ্ব-১৫ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ট্রাইব্রেকারে ৩-২ গোলে পাকিস্তানকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নের মুকুট পরল বাংলাদেশ। গত ৩রা নভেম্বর বাংলাদেশ সময় ২.৪৫ মিনিটে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুর নেপাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএনএফএ) কমপ্লেক্সে শিরোপার লড়াইয়ে নামে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান।

১-১ সমতায় থেকে প্রথমার্ধ শেষ করে দল দুটি। এরপর নির্ধারিত সময়ে আর কোনো গোল করতে পারেনি বাংলাদেশ-পাকিস্তানের কেউই। ফলে ম্যাচ গড়ায় ট্রাইব্রেকারে। এতে প্রথম গোলটিই বারের উপর দিয়ে পাঠিয়ে দেয় বাংলাদেশ। অপরদিকে পাকিস্তানও মিস করে তাদের প্রথম গোল। কিন্তু এরপরই এগিয়ে যায় বাংলাদেশ। পরপর তিনটি গোল করতে সফল হয় বাংলাদেশ আর শেষ গোলটি ফিরিয়ে দেশকে জয়ের আনন্দে ভাসান গোলরক্ষক মেহেদি।

ডাবল সেঞ্চুরিতে মুশফিকের বিশ্ব রেকর্ড

ঢাকা টেস্টে গত ১১ই নভেম্বর শুরু হওয়া ম্যাচে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে বিশ্বের প্রথম উইকেটরক্ষক-ব্যাটসম্যান হিসেবে দুটি ডাবল সেঞ্চুরির রেকর্ড গড়লেন মুশফিকুর রহিম। ৪০৭ বলে ১৬টি চার ও একটি ছক্কায় এমন কীর্তি গড়েন তিনি। মুশফিকের আগের ডাবল সেঞ্চুরিটি ছিল ২০১৩ সালে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে। আর উইকেটরক্ষক হিসেবে এর আগে মুশফিকসহ একটি করে ডাবল সেঞ্চুরি করেছিলেন ইমতিয়াজ আহমেদ, তাসলিম আরিফ, ব্র্যান্ডন কুরুপ্পু, অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার, অ্যাডাম গিলক্রিস্ট, কুমার সাঙ্গাকারা ও মাহেন্দ্র সিং ধোনি।

টি-টোয়েন্টি র‍্যাংকিংয়ে একধাপ এগিয়ে সাতে নাহিদা

টি-টোয়েন্টি র‍্যাংকিংয়ে নারী বোলারদের তালিকায় আগেই সেরা দশে স্থান পেয়েছেন বাংলাদেশের দুই বোলার রুমানা আহমেদ ও নাহিদা আক্তার। আইসিসি-র নতুন প্রকাশিত তালিকায় একধাপ উন্নতি হয়েছে নাহিদার। আর আগের মতোই ছয়ে আছেন রুমানা। তার রেটিং পয়েন্ট ৬০২। আর ৫৯৩ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে একধাপ এগিয়ে সাতে আছেন নাহিদা আক্তার।

প্রতিবেদন: মো. মামুন হোসেন

সচিত্র বাংলাদেশের মফস্বল এজেন্ট

কবি আ. ওয়াহাব
গ্রাম : দুধস্বর, ডাকঘর : ভাটই
উপজেলা : শৈলকূপা, জেলা : ঝিনাইদহ

আখতার হামিদ খান
সহযোগী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
সাভার কলেজ, সাভার, ঢাকা

ঢাকার স্থানীয় এজেন্ট

মো. ইউনুস, পীরজঙ্গী মাজার, মতিঝিল, ঢাকা
মিলন, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা
আব্দুল হান্নান, কমলাপুর, ঢাকা
সৃজনী, কমলাপুর, ঢাকা
আমির বুক হাউজ, পুরানা পল্টন, ঢাকা
পাঠশালা, শাহবাগ, ঢাকা
আলীরাজ, শাহবাগ, ঢাকা।

এ সকল এজেন্টের কাছ থেকে **সচিত্র বাংলাদেশ** ক্রয় করা যাবে।

বিশ্বজুড়ে নভেম্বর: স্মরণীয় ও বরণীয়

১লা নভেম্বর ২০০৭	বাংলাদেশের বিচার বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক হয়
৩রা নভেম্বর ১৯৩৩	নোবেল জয়ী বাঙালি অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের জন্ম
৩রা নভেম্বর ১৯৫৭	মহাকাশে প্রথম প্রাণী হিসেবে প্রেরিত হয় 'লাইকা' নামের একটি কুকুর
৩রা নভেম্বর ১৯৭৫	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে জাতীয় চার নেতাকে হত্যা
৩রা নভেম্বর ১৯৭৭	শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার মৃত্যু
৪ঠা নভেম্বর ১৯৭২	বাংলাদেশ সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত
৫ই নভেম্বর ১৮৭০	বাঙালি আইনজীবী এবং রাজনীতিবিদ চিত্তরঞ্জন দাশের জন্ম
৬ই নভেম্বর ১৮৬০	ষোড়শ মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে আব্রাহাম লিংকন নির্বাচিত হন
৬ই নভেম্বর ১৯৭৫	বাংলাদেশের ৬ষ্ঠ রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রথম বিচারপতি এএসএম সায়েম দায়িত্ব গ্রহণ করেন
৭ই নভেম্বর ১৮৬২	শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরের মৃত্যু
৭ই নভেম্বর ১৮৬৭	দুইবার নোবেল জয়ী একমাত্র নারী মেরি কুরির জন্ম
৭ই নভেম্বর ১৯৩৮	বাংলাদেশি সংগীত শিল্পী মো. আব্দুল জব্বারের জন্ম
৮ই নভেম্বর ১৬৭৪	ইংরেজ কবি জন মিল্টনের মৃত্যু
৮ই নভেম্বর ১৮৫৬	হ্যালির ধুমকেতুর আবিষ্কারক এডমন্ড হ্যালির জন্ম
৯ই নভেম্বর ১৮৭৭	মুসলিম কবি, দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ আল্লামা ইকবালের জন্ম
১০ই নভেম্বর ১৯৩৮	আধুনিক তুরস্কের জনক মোস্তাফা কামাল পাশার মৃত্যু
১০ই নভেম্বর ১৯৮৭	স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন নূর হোসেন
১১ই নভেম্বর ১৯১৮	মিত্রশক্তি ও জার্মানির মধ্যে চুক্তির ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে
১১ই নভেম্বর ২০০৪	স্বাধীন ফিলিস্তিন আন্দোলনের কিংবদন্তি ইয়াসির আরাফাতের মৃত্যু
১৩ই নভেম্বর ১৯১৩	সাহিত্যে নোবেলজয়ী হিসেবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম ঘোষণা
১৩ই নভেম্বর ১৯৪৭	মুসলিম সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম
১৩ই নভেম্বর ১৯৪৮	নন্দিত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের জন্ম
১৪ই নভেম্বর ১৮৮৯	ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর জন্ম
১৫ই নভেম্বর ১৯২০	সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় 'লীগ অব নেশন্সের' প্রথম সভা
১৫ই নভেম্বর ১৯৫৪	বাংলাদেশের লোকসংগীত শিল্পী এবং বংশীবাদক বারী সিদ্দিকীর জন্ম
১৬ই নভেম্বর ১৯৪৫	জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (UNESCO) প্রতিষ্ঠিত
১৬ই নভেম্বর ২০১২	বাংলা চলচ্চিত্র পরিচালক সুভাষ দত্তের মৃত্যু
১৭ই নভেম্বর ১৯৩১	সাহিত্যিক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মৃত্যু
১৭ই নভেম্বর ১৯৭৬	মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর মৃত্যু
১৭ই নভেম্বর ১৯৯৭	UNESCO ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়
১৮ই নভেম্বর ১৯৬৬	দেশের সর্ববৃহৎ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (ক্যাম্পাস আয়তন বিবেচনায়) যাত্রা শুরু
১৯শে নভেম্বর ১৮৩১	ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের নেতা সৈয়দ নিসার আলী তিতুমীরের মৃত্যু
১৯শে নভেম্বর ১৯১৭	ভারতের প্রথম ও একমাত্র নারী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর জন্ম
২০শে নভেম্বর ১৯৯৯	কবি ও নারীবাদী লেখিকা বেগম সুফিয়া কামালের মৃত্যু
২১শে নভেম্বর ১৯৭১	বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী গঠিত
২২শে নভেম্বর ১৯৬৩	৩৫তম মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির মৃত্যু
২৩শে নভেম্বর ১৯৩৭	বাঙালি বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর মৃত্যু
২৪শে নভেম্বর ২০১১	বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের ওয়ানডে মর্যাদা লাভ
২৫শে নভেম্বর ১৮৮০	ম্যালেরিয়া রোগের কারণ আবিষ্কার করেন ফরাসি বিজ্ঞানী লাভরান
২৫শে নভেম্বর ১৯০৬	বিখ্যাত নাট্যকার নুরুল মোমেনের জন্ম
২৫শে নভেম্বর ১৯১৫	সাধারণ আপেক্ষিকতার সমীকরণ তত্ত্ব প্রকাশ করেন বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন
২৬শে নভেম্বর ১৮৯০	ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম
২৬শে নভেম্বর ১৯১৯	সাহিত্যিক ও গবেষক মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের জন্ম
২৭শে নভেম্বর ১৮৫২	প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামার লেডি অগাস্টার মৃত্যু
২৭শে নভেম্বর ১৯২৫	শহিদ বুদ্ধিজীবী মুনীর চৌধুরীর জন্ম
২৮শে নভেম্বর ১৯৪৩	চিত্রশিল্পী কার্টুনিস্ট রফিকুন নবীর জন্ম
২৯শে নভেম্বর ১৮১২	বিশিষ্ট সমাজসেবক এবং দানবীর হাজী মুহাম্মদ মোহসীনের মৃত্যু
৩০শে নভেম্বর ১৮৫৮	বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর জন্ম
৩০শে নভেম্বর ১৯৯৮	বিজ্ঞান লেখক আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দিনের মৃত্যু।

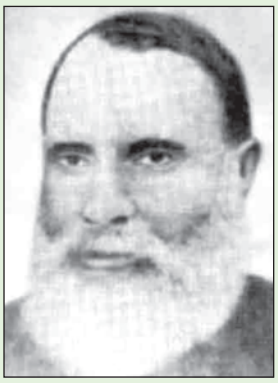

মীর মশাররফ হোসেন

ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও প্রাবন্ধিক মীর মশাররফ হোসেন ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ই নভেম্বর কুষ্টিয়া জেলার লাহিনীপাড়ায় এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মীর মোয়াজ্জেম হোসেন। ছোটোবেলায় বাড়িতে মুন্সির কাছে আরবি-ফারসি এবং পাঠশালায় পণ্ডিতের কাছে বাংলা শেখেন। তাঁর স্কুল জীবন কাটে প্রথমে কুষ্টিয়ায়, পরে পদমদী এবং শেষে কৃষ্ণনগরে। পরবর্তীতে কলকাতার কালীঘাট স্কুলে ভর্তি হলেও লেখাপড়ায় বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেননি।

মীর মশাররফ হোসেন ফরিদপুরের নবাব এস্টেটে দীর্ঘকাল চাকরি করেন। ১৮৮৫ সালে দেলদুয়ার এস্টেটের ম্যানেজার হয়ে টাঙ্গাইলে যান। তবে সেখানে বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেননি। এ সময় তিনি নিজ আবাস লাহিনীপাড়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি ১৯০৩ থেকে ১৯০৯ পর্যন্ত কলকাতায় অবস্থান করেন। এ সময় তিনি কলকাতার সংবাদ প্রভাকর ও কুমারখালির গ্রামবার্তা প্রকাশিকা পত্রিকায় মফস্বল সাংবাদিকের দায়িত্ব পালন করেন।

বঙ্কিমযুগের অন্যতম প্রধান গদ্যশিল্পী মীর মশাররফ হোসেন। ছাত্রজীবনেই *সংবাদ প্রভাকর* ও *গ্রামবার্তায়* তাঁর রচনা প্রকাশ পায়। মুসলমান সাহিত্যিক হিসেবে রচনাশৈলীর নৈপুণ্যে তৎকালীন বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে ঈর্ষণীয় অবস্থান সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলার মুসলিম সমাজের দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীর জড়তা দূর করে আধুনিক ধারায় ও রীতিতে সাহিত্যচর্চার উন্মেষ ঘটান মীর মশাররফ হোসেন। তিনি উপন্যাস, নাটক, জীবনী, আত্মজীবনী, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব, কাব্য, সংগীত বিষয়ক ৩৫টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। *রত্নবতী* (১৮৬৯), *বসন্তকুমারী* নাটক (১৮৭৩), *জমিদার দর্পণ* (নাটক, ১৮৭৩), *এর উপায় কি* (১৮৭৫), *বিষাদসিন্ধু* (১৮৮৫-১৮৯১), *উদাসীন পথিকের মনের কথা* (১৮৯০), *গাজী মিয়াঁর বস্তানী* (রস রচনা, ১৮৯৯), *ভাই ভাই এইতো চাই* (১৮৯৯), *মৌলুদ শরীফ* (১৯০৩) ইত্যাদি মীর মশাররফ হোসেনের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম।

বিষাদসিন্ধু (মহররমপর্ব ১৮৮৫, উদ্ধারপর্ব ১৮৮৭, এজিদবধ পর্ব ১৮৯১) তাঁর বিস্ময়কর সৃষ্টি। মহররমের বিষাদময় ঐতিহাসিক কাহিনি অবলম্বনে রচিত মহাকাব্যধর্মী এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের এক স্থায়ী সম্পদ।

১৯১২ সালে পদমদীতেই খ্যাতনামা সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন মৃত্যুবরণ করেন।

প্রতিবেদন: নাসরিন নিশি